াল রাত্রি



মরেশ বসু

4007

অকাল বৃষ্টি

অকালবৃষ্টি

সমরেশ বসু

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র : ১৩৬০

প্রকাশক
প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
তীর্থনাথ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬, গ্রে স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বাঁধাই
মডার্ণ বাইণ্ডার্স

দাম :
আড়াই টাকা

বিষয়-সূচী

4007

অকাল বৃষ্টি

'আবার তুই মেয়েমানুষ এনে তুললি এখানে?' জিজ্ঞাসা করল ভূতেশ হালদার তার কটা ক্রুদ্ধ চোখ তুলে। 'হাঁ, আনলুম।' কথা শেষ করে দেওয়ার মত একটা ভাব করে কোমরের কাছ থেকে কাপড় সরিয়ে দাদ চুলকোতে লাগল সিধু ডোম।

আর যে মেয়েমানুষটিকে আনা হয়েছে, সে বুড়ো বেঁটে গাট্টাগোট্টা, বটতলার চালাটার দরজায় বসে তার দীর্ঘ চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে মুখ টিপে টিপে হাসছে এদের দুজনার দিকে আড় চোখে চেয়ে চেয়ে।

ওদিকে পাঁচিল দিয়ে আড়াল করা শ্মশানের মধ্যে একটা মড়া পুড়ছে। তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। মড়া বয়ে আনা দলটি পশ্চিম দিকের ঘাটে গঙ্গামুখো বসে নিজেদের মধ্যে জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে একটা খুব উত্তেজিত আলোচনায় ব্যস্ত। শ্মশানের কুকুরগুলো নেশাখোরের মত জুলজুলে চোখে লেজ গুটিয়ে শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে, নুলো বাড়িয়ে ছাই আর পোড়া কাঠের গাদা ঘাঁটছে, নয়তো তাদের লাল দগদগে মুখের বিশাল কশ বিস্ফারিত করে লোভিষ্টির মত দেখছে মড়া পোড়ার দিকে।

ভাটা পড়ে গঙ্গা নেমে গেছে অনেকখানি। অগ্রহায়ণের গঙ্গা, জল খানিক স্বচ্ছ। স্রোতস্বিনী গাঙ্গের মত গঙ্গা কল্‌কল্ করে বইছে। তরঙ্গায়িতা গৈরিক সুরেশ্বরী যেন ছেয়ালো একহারা এক কিশোরী মেয়ে।

বেলা শেষ হয়ে আসছে। বটগাছের উপর মাটীর দিকে ঘাড় নোয়ানো শকুনগুলোর চোখ কানা হয়ে যাচ্ছে। রাতকানা পাখী ওরা।

আগে গঙ্গার ধারে ধারে ঘাটে অঘাটে মড়া পোড়ান হত। এখন এ গাঁ হয়েছে চটকল শহর। মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে মস্ত বড়। কোন্ এক চটকলের

সাহেব এ শ্মশান তৈরী করে দিয়েছে। ইঁটে খোদাই করে ইংরেজীতে লেখা আছে, এস্ট. ১৯২৬। মস্ত উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও শ্মশান। মড়া যখন পোড়ে, তখন দূর থেকে মনে হয় বুঝি কোন চটকলের চিম্‌নি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। পূব্‌দিক ঘেঁসে বটতলায় ডোমচালার মেঝেটা ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভূতেশ হালদার তার ছোট ছোট কটা চোখের চোরা দৃষ্টিতে মেয়েটাকে একবার দেখে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াল যেন একটা লম্বা ছিপছিপে পোড়া কাঠ। কালো নয়, গায়ের রংটা ছাই ছাই। সারা মুখে বসন্তের দাগ, নাকটা ঘোড়ার নাকের মত লম্বা, চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা। কানে একটা হলদে পেন্সিল গোঁজা, গায়ে তার শরীরের অনুপাতে নিতান্ত ছোট খাকী শার্ট, গঙ্গার জলে কাচা লালচে ধুতি দশ হাত হলেও হাঁটুর বেশী নীচে নামে নি।

এই হল ভূতেশ, চিত্রগুপ্তের অবতার অর্থাৎ মৃত্যু রেজিষ্ট্রার। মাইল কয়েকের এলাকার মৃত্যুর খতিয়ান তার কাছে। নামধাম, কারণ অকারণ স্ত্রী কি পুরুষ, মৃতের চৌদ্দ পুরুষের ঠিকানা লেখা আছে ভূতেশের চটের স্থতো দিয়ে বাঁধা মোটা খাতাটায়। এই হল তার আসল পদমর্যাদা, বাকী কাজটুকু স্যানিটরি ইন্‌স্পেক্টরের এ্যাসিষ্টাণ্ট হয়ে সকালের কয়েক ঘণ্টা এদিক ওদিকে ঝাড়ুদার মেথরের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ান। তবে এটা হল ফালতু কাজ। মাইনে ত্রিশ টাকা। নামের গেরোতেই বোধ হয় তাকে এ কাজটি বেছে নিতে হয়েছে। এখানকার লোকে অন্তত তাই বলে। মৃত্যু রেজিষ্ট্রার হিসাবে তার এখানকার সহকর্মী হল সিধু ডোম। দোহারা শক্ত কালো শরীর, চোয়াল উঠানো গাল, আ-ছাঁটা গোঁফ, একজোড়া কালো কুচকুচে মস্তবড় টেরা চোখ, এক মাথা কালো পাঁশুটে ভেড়ার লোমের মত কোঁচকানো চুল। রেজেষ্ট্রি হয়ে গেলে চিতায় কাঠ সাজায় সে, মড়া তোলার আগে শত শোক ও আপত্তি সত্ত্বে মড়ার গায়ের জামা কাপড় খুলে নেওয়ার চেষ্টা করে, মরা মেয়েমানুষের গায়ে গয়না থাকলে চেষ্টা করে তা খুলে নেওয়ার। সে হিসাব রাখে এ চাকলার কাকে পোড়াতে কত কাঠ লেগেছিল, কাকে আধা পোড়ানো হয়েছিল, কার কোন্ অঙ্গটা পুড়েছিল আগে, কিংবা লোকে যেমন শুকনো ও ভেজা কাঠের গুণ

বর্ণনা করে, তেমনি কার মড়া পোড়াবার পক্ষে বেশ খনখনে ছিল বা স্যাঁৎসেঁতে ছিল তার হিসাবও সে কড়ায় গণ্ডায় দিতে পারে।

ভূতেশ যদি চিত্রগুপ্ত হয়, সিধু ডোম তা হলে সাক্ষাৎ যম। সিধুর অবশ্য ধারণা, এটা তার রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত এ জীবনের ভোগান্তি, আগামী জন্মটা তার ভালই হবে।

তারা দু'জনে এ গাঁয়েরই মানুষ। তারা বলে গাঁ, লোকে বলে শহর। উভয়ে তারা ছোট কাল থেকে পরিচিত। তবে একজন হল ডোম, অপর জন বামুন। মেলামেশা তাদের সম্ভব ছিল না, দরকারও ছিল না, আর আজ দীর্ঘ দশ বছর ধরে একই সঙ্গে কাজের মধ্যে থেকে ভূতেশ 'বাবু' থেকে সিধুর কাছে 'ঠাকুর' হয়েছে। সম্পর্কটা ঠিক বন্ধুত্ব না হলেও রেজিষ্ট্রিবাবু আর ডোমের মর্যাদাপূর্ণ ফারাকটা যেন নেই। একজন কথায় কথায় ইংরেজী বলে, অপরজন রেগে গেলে বলে হিন্দি। ভূতেশকে উঠতে দেখে সিধু বলল, 'একটা বিড়ি দেও দিনি ঠাউর।'

'বিড়ি নেই।' বলে ভূতেশ একটা বিড়ি পকেট থেকে নিয়ে তার নিজের ঠোঁটে চেপে ধরল।

বিড়ি এখন পাবে না বুঝেই সিধু চিতার কাছে গিয়ে তার হাতের পোড়া লাঠিটা দিয়ে ঝিমিয়ে পোড়া আগুন উস্‌কে দিল, দগ্ধ মৃতদেহটা দিল উলটে পালটে এবং দিতে দিতে আগুনের তাতে দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল সে, ঠাকুর মেয়েমানুষ দেখলেই এমন খেপে যায় কেন?

যাদের মড়া, তাদের একজন বলল, 'একটু আস্তে সুস্থে দাও বাবা, এমন ঠ্যাঙ্গাড়ের মত করছ কেন?' সিধু হেসে বলল, 'মরতেও এত, তবুতো ঠেক্কে রাখতে পারলে না বাবু।' মনে মনে বলল, 'আর শালা আমি য্যাখন মড়ার জামাটা চাইলাম ত্যাখন তো দরদ দেখা গেল না।"

কথাবার্তা একটু চেপেচুপে না বললে বখ্‌শিসটা ফাঁক যাওয়ার সম্ভাবনা। ভূতেশেরও পাওনা আছে। তবে ভূতেশ সেটাকে বখ্‌শিস বলে না, বলে রেজিষ্ট্রির নজরানা। পাওনা বলতে পারে না, কারণ দাবীর ব্যাপার নয় ওটা।

তা ছাড়া কারণে অকারণে ভূতেশ নানান রকম গণ্ডগোল করে থাকে। আইবুড়ো মেয়ের মড়া হলে তো কথাই নেই। সে তার ঘোড়ার মত লম্বা নাক ফুলিয়ে কটা খটাস চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করবে, 'কি হয়েছিল মেয়েটার?'

'কালাজ্বর।'

'হুঁ, কিন্তু মড়াটা থাক্, কালকে মেডিকেল অফিসার এলে দেখে অনুমতি দেবে।'

'কারণ?'

বুঝুক না বুঝুক, অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত ভূতেশ বলে, 'কি করব মশাই, এ রকম কত সুইসাইড্ কেশ্ কিংবা এই ধরুণ যুবতী মেয়ে কোন গোলমাল করে ফেলল, মেটাতে গিয়ে হয় তো ফসকে গেল জান্। তখন—'

অপর পক্ষ থেকে হয় তো প্রশ্ন আসে, 'তা এটাও সেরকম মনে হচ্ছে নাকি?'

ভূতেশ তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, 'হয়তো নয়। তবে বোঝেনই তো, হুকুম আছে, কোনরকম সন্দেহ টন্দেহ হলে।...আমি তো আর ডাক্তার নই।'

ফলে কখনো হয় তো পকেটে পাঁচ দশ কিছু এসে পড়ে, নয় তো গালাগাল আর শাসানি। কিন্তু ঢিল একবার ছুঁড়ে দিলে যা হোক একটা হবেই। পয়সা এলে ভূতেশ আরও গম্ভীর হয়ে বলে, 'খামোখা বকালেন। যাই হোক্, ডোমের পাওনাটা মিটিয়ে দেবেন।' না হলে রাতভর মড়া আটকে রেখে মেডিকেল অফিসারকে খবর দিতে ছোটে সকালে। সিধু ডোম এ সময়ে তার নিষ্পলক টেরা চোখে ঠাকুরের মারপ্যাঁচ লক্ষ্য করে আর মনে মনে তারিফ করে। কথা চলে। শ্মশানের কুকুরগুলোর মত উৎসুক নিবিষ্ট চোখে মুখের কশ বিস্ফারিত করে নীরবে হাসে সে।

সিধু ফিরে এসে দেখল তখনও ভূতেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ঠোঁটের কোনে বিড়িটা গেছে নিভে। গাঁয়ের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। যেন যাবার জন্য পা বাড়িয়ে কিছু মনে পড়েছে তার। আর মেয়েটা আঁট করে খোঁপা পিটিয়ে পিটিয়ে বেঁধে মুখ টিপে টিপে হাসছে।

সিধু ফিরে এসেছে টের পেয়ে পেছন ফিরেই ভূতেশ বলল: 'আবার বল্‌ছি, মিছে এ সব ঝঞ্ঝাট করিস্‌নি। শ্মশানে মেয়েমানুষ নিয়ে কেউ থাকে না।

এর আগে যে মেয়েটাকে এনেছিলি, দেখলি তো সেবারের মড়কে ছুঁড়ি পালিয়ে গেল। মড়া ঠ্যাঙ্গাচ্ছিস, মড়া ঠ্যাঙ্গা, ওসব রম্‌জানি কেন ?'

সিধু সবেমাত্র তাড়ির ভাঁড় নিয়ে প্রথম চুমুকটা দিয়েছিল। হঠাৎ সেই পুরনো স্মৃতিটা ঠাকুর উস্‌কে দিতেই ভাঁড়টা নামিয়ে নিল সে মুখ থেকে। তার ট্যারা চোখের ভাব বোঝা দায়। মনে হল যেন জবাব দিতে গিয়ে অসহায় বোধ করছে সে। পর মুহূর্তেই তার একটা চোখের তারা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে শুধু সাদা ক্ষেত্রটি চকচকিয়ে উঠল। গোঁফজোড়া মুচ্‌ড়ে দিয়ে চিবিয়ে বলল সে, 'তুমি কি ঠাউর তোমার মত হতে বলছ আমাকে ? তা হবে না। একটা পালিয়েছে, এই তো ধরে নিয়ে এসেছি আরেকটাকে। ক'টা পালাবে। যত পালাবে, তত আনব।'

'হ্যাঁ, তোর জন্য মেয়েমানুষ হত্যে দিয়ে পড়ে আছে।'

'ঠাউর, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।'

'মেলা বকিস্‌নি। ভাত তোর ঘরে হাঁড়ি ভরতি, না ? বলে, তাড়ির দাম যোগাতে পারিস্‌নে, ভাত ছড়িয়ে কাক ডাকবি।'

কথাটা নির্মম সত্য এবং তার নিয়ে আসা মেয়েমানুষের সামনেই ভূতেশ ব্যঙ্গ করে সে কথা বলে তার বুকে অসহ্য জ্বলুনি ধরিয়ে দিল। কয়েক ঢোক তাড়ি গিলে সে হঠাৎ বলল ; 'বউ নিয়ে তো কখনো ঘর করলে না ঠাউর, এ সবের আদর তুম্‌ নহি সমঝেগা।'

চকিতে ভূতেশ ফিরে দাঁড়াল। ভাঁটার মত জ্বলে উঠল তার কটা চোখ। পোড়া কাঠের ধারে ধারে যেন লুকানো অঙ্গার আচমকা হাওয়ায় গন্‌গনে হয়ে দেখা দিল। বলল, 'বউ নিয়ে আমি ঘর করিনি, তুই করেছিস, না ? ব্লাডি ডোম !'

সিধুর গলা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এল। 'তা বেলাডি ফেলাডি য্যাতই বল, ওকে কি ঘর করা বলে ? এমন অপসরীর মত বউ, কন্দর্পকান্তি ছেলে তুমি ত্যাগ দিয়ে রাখলে। পান তোমার অমন পাষাণ বলেই না আমাকেও তাই বলছ।'

'আমি পাষাণ, আর তোরা সব কাদার মত নরম।' ভূতেশ তার লম্বা লম্বা দাঁত যেন ভেংচে উঠল। পোড়া বিড়িটা ধরাল আবার।

বটগাছের ঝুপ্‌সি ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে নামে অন্ধকার। পাখা ঝাপটার শব্দ শোনা যায় শকুনের। চিতার কাঠ পোড়ার চড়বড় শব্দে মনে হয় পুঁটকে ফটাস্ ফাটছে। ওদিকের খেয়াঘাটের নৌকা বুঝি ভিড়াল। এলোমেলো গলার স্বর শোনা যায় দু' একটা। অনেক অদৃশ্য মানুষের নিঃশ্বাসের মত হাওয়ায় সরসরিয়ে ওঠে বটপাতা।

মেয়েটা একটা লম্ফ জ্বালিয়ে ভূতেশ-সিধুর মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে গেল। গায়ে তার একটা ভাল দামী জামা এ পরিবেশের মধ্যে যেন কাদায় আধ-ঢাকা সোনার চকচকানি। শাড়ীটাও নিতান্ত অল্পদামী নয়, আর তার যৌবনভরা বলিষ্ঠ শরীরে আনাড়িভাবে পরানো শাড়ীতে তাকে মহাভৈরবী নয়, ইন্দ্রানীর রূপ দিয়েছে। মৃতদের দৌলতে অমন দু' একখানা জামা আর শাড়ী সিধু ডোমের বেড়ায় মাকড়সার ঝুলের মধ্যে গোঁজা আছে। মেয়েটির কালো কালো টানা চোখে রহস্য বংকিম হাসি লেগেই আছে। শুধু মুখে কোন কথা নেই।

বিড়িটা ফেলে দিয়ে হঠাৎ ভূতেশ বলল, 'এক পাত্তর দে দিনি তোর ওই ভাঁড়ের মাল।'

শান্ত আর গম্ভীর গলায় বলতে বলতে সে বসল। সিধুর কাছে এসব নতুন নয়। সেজন্য একটা আলাদা ছোট হাঁড়ি বাড়িয়ে দিল ঠাকুরের দিকে। নিজের এঁটো সে কখনো দেয় না তাকে। কিন্তু ঠাকুর এমন তাড়ির ভাঁড় নিয়ে বসে খুব ক্বচিৎ, যখন এ দুনিয়ার উপর বিরক্তির তার সীমা থাকে না। নেশার ঘোরে সারা দুনিয়ার, বিশেষ করে মেয়েমানুষের, পিণ্ডি শ্রাদ্ধ করার জন্য প্রাণ তার জ্বলতে থাকে।

পাত্রটি প্রায় নিঃশেষ করার পর ভূতেশের গম্ভীর আর বিদ্রূপ করা গলা শোনা যায়।

'অপ্‌সরীর মত বউ আর কন্দর্পের মত ছেলে আমি ত্যাগ দিয়েছি, আমি পাষাণ!···তুই ব্যাটা কানা, আমার দিকে একবার তাকিয়ে ত্যাক্ দিনি?'

ব্যাপারটা না বুঝে সিধু তার ড্যাবা ট্যারা চোখ তুলে ধরল ভূতেশের দিকে। মেয়েটিও তাকাল। ঠোঁটের কোনে হাসিটুকু তার ঝরব ঝরব করছে।

চোখের কোণ কুঁচকে ভূতেশ বলল, 'আমার কখনো অপ্সরীর মত বউ হয়, না, কন্দর্পের মত ছেলে হতে পারে—অ্যাঁ? বিয়ের রাতে তোদের অপ্সরী বউ ভয় পেয়ে বলেছিল, 'মা গো, যেন পোড়া কাঠ!' আমি হলাম পোড়া কাঠ। আমার সঙ্গে কেউ ঘর করতে পারে? কিন্তু তখনো নিজের মুখটা ভাল করে কোনদিন বোধ হয় দেখিনি, তাই রাগে ঘেন্নায় মাথার রক্ত চন্‌চনিয়ে উঠল। ফুলশয্যের রাতে পায়ের থেকে জুতো খুলে বেধড়ক ঠ্যাঙ্গালাম নতুন বউকে। আহা, দুধে আলতার সে রং, আমার বুক জ্বালানো সে হাসি ফেটে বেরুল রক্ত আর চোখের জল। পরদিন শ্বশুর লোকজন নিয়ে এসে মেয়ে নিয়ে চলে গেল। একে হাভাতে বামুন ঘরের আকাট ছেলে, তায় এই কুৎসিত চেহারা আর নামটাও আমার কি চমৎকার বল্ দি'নি? কিন্তু ঘরের লোক অবধি বললে দোষ আমারই। মাস কয়েক পরে শ্বশুরবাড়ী থেকে ডাক এল, জামায়ের ডাক, বুঝ্‌লি? গেলাম। অপ্সরী বউয়ের বোন সব উর্বশী শালীরা পালিয়ে গেল আমাকে দেখে। শাশুড়ী এল না দেখা করতে। বউ এল, তার কার্তিকের মত সুন্দর জামাইবাবুর গা ঘেঁষে ভয়ে ভয়ে। ভায়রাভায়া আমার সঙ্গে কথা বল্‌ল না। রাতে শুতে গেলাম। মনের কথা আর তোকে বলব কি, সে জীবনে একবারই হয়েছিল সে অবস্থা। কিন্তু সারা রাতে বউ এল না। পরদিন দেখলাম, বউ তার জামাইবাবুর সঙ্গে হেসে জমিয়ে কথা বলছে। আবার রাত হল, শুতে গেলাম। অনেক রাত, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চুড়ির শব্দে জেগে দেখি, অন্ধকার। পাশে হাতিয়ে দেখলাম বিছানা ফাঁকা। উঠে বারান্দার জানালার কাছে গিয়ে দেখি তোদের অপ্সরী বউ ভগ্নিপতির বুকে মুখ গুঁজে বলছে, 'ওই রাক্ষসটার কাছে যদি আমাকে তোমরা পাঠাও, গলায় দড়ি দেব আমি।'

বলতে বলতে ক্ষিপ্ত চিতাবাঘের মত জ্বলে উঠল ভূতেশের কটা চোখ, কান দুটো নড়ে উঠল মাথার শিরে টান পড়ে, অশ্বনাসারন্ধ্র উঠল ফুলে ফুলে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'যদি সত্যই রাক্ষস হতুম তা হলে ঘাড় মটকে ওর রক্ত খেতুম আমি, মাইরী! মাইরী বল্‌ছি, রাক্ষস হলে এই মেয়েমানুষগুলোকে'—

বাক্‌রুদ্ধ হল তার চালার দরজায় ঠায় তার দিকে তাকিয়ে থাকা মেয়েটার উপর চোখ পড়ে। ভয়ে বিস্ময়ে বেদনায় সে কালো চোখ বিচিত্র হয়ে উঠেছে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ভূতেশ আচম্‌কা তাড়িশূন্য হাঁড়িটা বটতলায় ছুঁড়ে দিয়ে ছাই গাদায় গিয়ে দাঁড়াল গাঁয়ের দিকে মুখ করে।

সিধুর ট্যারা চোখের ভাব বোঝা দায়। সে চোখে বিস্ময় না বেদনা, বোঝা গেল না। সে আস্তে আস্তে উঠে ভূতেশের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

শ্মশানের বটতলার আলো-আঁধারিতে মানুষ চেনা যায় না, মনে হয় দুটো কালো কালো প্রেতমূর্তি চিতা ঝাড়ানো ছাইগাদায় দাঁড়িয়ে গ্রামের দিকে তাকিয়ে মতলব ভাঁজছে। যেন প্রতীক্ষা করছে নতুন শব আসবার। তাদের পাশে এসে কুকুরগুলোও জুল্‌জুলে চোখে তাকিয়ে থাকে গ্রামের দিকে। পাশ দিয়ে খেয়া ঘাটের পথ। যাত্রীরা সে মূর্তি দেখে ভয়ে পেছিয়ে যায়। বলাবলি করে, 'শালা ভূত দুটো এবার কাকে শ্মশানে টানবে তাই দেখছে।'

হঠাৎ ভূতেশ বলল, 'কিরে, লোহার না ইঁটের মড়া পুড়ছে যে এখনো শেষ হল না?'

সে কথা বোধ হয় ভাবছিল না সিধু। আচমকা একটা নিঃশ্বাস ফেলে চিতার কাছে চলে গেল। যাওয়ার সময় নিচের হাঁড়িটা মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে গেল, 'নে, দু' চুমুক দিয়ে নে।'

মেয়েটা তাকিয়ে দেখল কিন্তু চুমুক দিল না।

মাটীতে পোঁতা একটা শিশুর তাজা মৃতদেহ মুখে নিয়ে একটা শেয়াল গঙ্গার ধারে চলে যাচ্ছিল। কুকুরগুলোর নজরে পড়তেই অন্ধকারে হাওয়ার বেগে ছুটে গেল সেদিকে।

এক গাদা থুথু ফেলে কট্‌ক্তি করে উঠল ভূতেশ, 'ভাল করে পুঁতেও দেয় নি। খা শালারা পেট ভরে।'

মড়া পোড়ানো শেষ হল। ভূতেশ এগিয়ে এল সামনে। মড়া বওয়াদলের একজন ভূতেশের হাতে একটা টাকা দিল।

'এই দিলেন?' রুষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল ভূতেশ।

লোকটা বলল, 'ওই নিয়ে নিন দাদা, আর বেশী নেই।' বলে সিধুর দিকে একটা আধুলি বাড়িয়ে দিল।

সিধুর ট্যারা চোখে নির্মম শ্লেষ। বলল, 'ওই পেকাণ্ড মড়াটা পুড়োতে মাত্তর আট আনা? বারো আনার তো বাবু তাড়িই খরচা হয়ে গেল।'

'আমরা কি তোমার তাড়ির খরচা যোগাতে এসেছি?' লোকটা বলল।

সিধু হাত উল্‌টে বলল, 'তা ছাড়া আর খাই কি বাবু? ও পয়সা আপনি মায়ের মন্দিরে দিয়ে দেনগে, জোর তো কিছু নেই।' মনে মনে বলল, মড়ার গায়ের জামাটা দিলেও না হয় কথা ছিল।

লোকগুলো এক বিচিত্র ভয়-ঘেন্না মেশানো চোখে শ্মশানের এ মানুষ দুটোকে একবার দেখে একটা টাকা ছুঁড়ে দিল সিধুর দিকে।

সিধু টাকাটা উঠিয়ে বলল, 'জন্মালে ধাইমাগী আর ম'লে এ ডোম বেটা, এ দু'হাত ছাড়া তো চলে না বাবু।'

বলে সে চিতা সাফ করতে লেগে গেল। চীৎকার করে চালার দিকে মুখ করে ডাকল, 'আরে হই, কি নাম তোর, এদিকে আয় মাগী।'

মেয়েটা এগিয়ে এল গাছকোমর বেঁধে। শ্মশানের মাঝে এক বেখাপ্পা জীব, গাছকোমর বেঁধে শাড়ীর রেখায় রেখায় যার উছলানো যৌবন চলতে ফিরতে গায়ে ঝাপটা দেয়।

মুখ টিপে কটা চোখে খটাস দৃষ্টি নিয়ে ভূতেশ দাঁড়িয়ে রইল।

ওদের কাজ কর্ম সারা হলে সিধু এসে বলল, 'দেও দিনি ঠাউর বিড়ি একটা এবার।

—'কেন, তাড়িতে হল না?'

সিধুর তাড়িমত্ত লালচোখ হাসিতে বুজে এল।—'তোমার অমন বাবার পেসাদ পোরা বিড়ি! দুটো টান দিলে শরীলের জাম একটু ছাড়ত।'

অর্থাৎ ভূতেশের বিড়ির মধ্যে সুখা তামাক নেই, আছে গাঁজা ভরা। সিধু তাকে বাবার পেসাদই বলে।

ভূতেশ মুখ ভেংচে বলল, 'মাইরি আর কি!'

তারপর কি মনে করে একটা বিড়ি ছুঁড়ে দিল সিধুর দিকে। সিধু বিড়িটা মেয়েটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'ছাইগাদা থেকে ধরিয়ে নিয়ে আয় তো!'

মেয়েটা ভ্রূ টেনে ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'মাগো! ওর মধ্যে গাঁজা পোরা রয়েছে যে?'

'তা নয় তো কি, বিষ রয়েছে?' সিধু বলল ট্যারা চোখ বাঁকিয়ে, 'বিড়ি গাঁজা ফুঁকতে পারবি নে, পারবি নে তাড়ি টানতে, তবে কি পোড়া মড়া খেয়ে থাকবি?'

মেয়েটা খিল খিল করে হেসে উঠল। অমনি ভূতেশ মুখটা বিকৃতি করে ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'তা'হলে মেয়েমানুষ নিয়ে র‍্যালা করবি তুই এখানে?'

কি একটা জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে সামনে এসে সিধু নেশামত্ত চোখ দুটো যতটা সম্ভব বড় করে জিজ্ঞেস করল, 'তা'হলে ঠাউর নোকে যে বলে সে কন্দপকান্তি ছেলেটা তোমারই?'

'তোমার মাথা ষ্টুপিড্।' ধম্‌কে উঠল ভূতেশ। মেয়েটা তখন জ্বলন্ত অঙ্গারের গায়ে বিড়িটা ঠেকিয়ে ফুঁ দিচ্ছে। সেদিকে একবার দেখে ভূতেশ ফিরে বলল, 'ব্যাটাচ্ছেলের শিক্ষা হয়নি। দাঁড়া আসুক ফাগুন চৈত্, লাগুক মড়কটা, কে ঠেকায় তোর মেয়েমানুষকে একবার দেখব।'

মড়ক লাগবে এও যেমন তার কাছে নিশ্চিত, মেয়েটাও পালাবে সেটাও তেমনি নির্ভুল!

সামনে শহরের ধারে জেলেপাড়াতেই হাফগেরস্থ শৈলী জেলেনীর বাড়ীতে তার ঘর। পথটুকু এক লাফে পেরুতে পারলেই যেন ভাল হত, এত তাড়াতাড়ি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুলো ভূতেশ। মনটা তার কিছু ওলট পালট হয়ে গেছে, সিধুর উপর রাগ না নিজের উপর বিতৃষ্ণা, তা সে নিজেই বুঝল না।

খানিকটা এগুতেই বুড়ো হরেন কৈবর্তের একঘেঁয়ে কাশির শব্দ তার কানে এল। শৈলীর ভাসুর। কাশে বুড়ো সারা রাতই। মনে হতেই ভূতেশ খিঁচিয়ে উঠল, 'শালা বুড়ো মলেও দুটো পয়সা আসত পকেটে।'

আর বস্তীর ভিতরে যে সব মেয়েপুরুষেরা ঝগড়া লাগিয়েছে তাদের মৃত্যুতে অতগুলো পয়সা পাওয়া দুরাশা ভেবে বোধ হয় বলল, 'কবে এ আপদগুলোর নাম উঠবে খাতায়, কে জানে ?' অর্থাৎ তার মৃত্যু রেজিস্টার খাতায়।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল ভূতেশকে লক্ষ্য করে, 'কোত্থেকে খুড়ো ?'

'দক্ষিণ দোর থেকে।' দেখতে দেখতে বাড়ীর অন্ধকার গলিটাতে ঢুকে পড়ল সে।

দিন যায়। ভূতেশ সেই সকাল থেকে দুপুর অবধি ঝাড়ুদার মেথরের পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ায়। কোথাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুটো গালাগাল শোনে কিংবা তাকে মধ্যস্থ করেই কেউ হয়তো মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, কমিশনারের আগুশ্রাদ্ধ করে। কেন না, সে মিউনিসিপ্যালিটির লোক তো ? আবার এসব লোকেরাই যখন শ্মশানে শব নিয়ে যায় তখন শত পরিচিত হলেও ভূতেশ তার কটা চোখ কুঁচকে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে, নাম কি ? বয়স কত ? বাপের নাম ? ঠিকানা ? যেন এখানকার জমিদারীটা তারই। এদিক ওদিক হলে রেহাই নেই।

শীতকাল। শ্মশানের বটগাছটার পাতা ঝরে যায়, ন্যাড়া হয়ে যায় একেবারে। বেশীর ভাগ সময় শ্মশান ফাঁকাই থাকে এখন। এ সময়টা মানুষ মরে একটু কম। তবে এটা চটকল শহর, মানুষে ঠাসাঠাসি। গড়ে অন্যান্য জায়গা থেকে অবশ্য মৃতের হারটা এখানে বেশীই।

তবু ভূতেশকে আজকাল সিধুর বটতলাতেই বেশী দেখা যায়। হ্যাঁ, তার বদ্ধজমাট প্রাণের কোঠায় যেন হাওয়া লেগেছে। সিধু খুব আড়ালে গিয়ে মাথা নাড়ে আর মনে মনে বলে, হায় রে পড়া কপাল !

কিন্তু এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ভূতেশ আর সিধুতে। যেন একটা নূতন সংসার গড়েছে তারা এখানে। হিংসা দ্বেষ তো দূরের কথা, তাদের ফাঁকা জীবন যেন পুষ্ট হয়ে উঠেছে। ভূতেশ শুধু অবাক নয়, তার সারা গায়ের মধ্যে এক অপূর্ব শিহরণ জেগে ওঠে থেকে থেকে আর নিজের ছাই বর্ণ ধূসর রুক্ষ শরীরটাকে দেখে আতিপাতি করে। প্রথম দিনের সে কথা। একে

গাঁজাভরা বিড়ি, তার উপরে সিধু আর সে ভাঁড়ের পর ভাঁড় শেষ করে শুধু বুঁদ নয়, একেবারে অচেতন হয়ে পড়েছিল। আর ওই মেয়ে গঙ্গার জলের ছিটা দিয়েছিল চোখে মুখে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দু' হাতে সাপটে ধরে টেনে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ছাইগাদা থেকে। অচেতন শরীরে চেতন ফিরেই আসেনি, বিড় বিড় করে বার বার বলেছিল, 'আমি যে পোড়া কাঠ, ছেড়ে দাও, ফেলে দাও।'

সে মেয়ে হেসেছিল। সে হাসির নাম জানে না ভূতেশ। মনে হয়েছিল মাতাল। জীবনে এ মাতলামির স্বাদ যে জানত না।

তবু ভূতেশ মাঝে মাঝে বলে ওঠে, 'শ্মশানের মধ্যে মেয়েমানুষ নিয়ে ধ্যালান ছাড় বাপু। ও তো কাটুল বলে।'

তার পর তার কটা চোখ দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে সিধুকে, 'ওকেই জিজ্ঞেস করে ছাখনা।'

মেয়েটা ভ্রূ বাঁকিয়ে নীরবে হাসে। কখনো বা কপট গাম্ভীর্যে বলে, 'তা বাপু, না ম'লে কে আসে তোমাদের এখানে?'

সিধু হাসে। ভূতেশের কটা চোখের কোঁচকানিতে অবিশ্বাস্য হাসি ওঠে চকচকিয়ে। তারপর তারা তিনজনে বসে অদ্ভুত সব গল্প জুড়ে দেয়। কোন দিন মড়া পোড়ে, কোন দিন পোড়ে না। শ্মশানের কুকুরগুলো তাদের ঘিরে থাকে শুয়ে বসে।

মেয়েটি কখনো তাদের চা করে দেয়, বিড়ি ধরিয়ে দেয়, মাটীর গেলাসে ঢেলে দেয় তাড়ি। নিজেও কোন কোন সময় গেলে দু' এক ঢোক। তারপর প্রাণের আবেগে তিনজনেই তারা খানিকটা সতেজ হয়ে ওঠে। ভূতেশ বলে, 'এক এক সময় মনে হয়, শালা দুনিয়াটাকেই খাতায় তুলে ছেড়ে দিই।' অর্থাৎ তার মৃত্যু রেজিষ্ট্রীর খাতায়।

সিধু বলে, 'খাতায় তুলে কি হবে ঠাউর, দিতে হয় চিতায় তুলে দেও, কাজ হবে।'

মেয়েটি বলে অভিমান করে, 'শ্মশানে মশানে থেকে তোমাদের খালি

এক কথা। পুড়ুতেই শিখেছ খালি। আমাকে পুড়ুবার জন্যও বুঝি হাঁ করে আছ তোমরা ? চিতা ধুয়ে তবে গঙ্গাজলের ছিটা দেও কেন ?'

জবাবে তারা দু'জনে চুপ করে থাকে। খানিকক্ষণ পরে ভূতেশ বলে, 'শুনলি কথা ? দেখবি, ও ঠিক কেটে পড়বে।'

কোন কোনদিন সন্ধ্যার পরে দেখা যায় পুরনো ছাইয়ের ঢিপিটায় ভূতেশ সিধু অস্পষ্ট ছায়া নিয়ে দুটো প্রেতের মত গাঁয়ের দিকে কিংবা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে। আজকাল তাদের দুই মূর্তির মাঝখানে মাঝে মাঝে আর একটা মূর্তি দেখা যায়। নারীমূর্তি। অন্ধকারে সে দেহের রেখায় রেখায় কি যে প্রাণ-ভোলানো বাহার! দুই পুরুষের দিকে বারেক তাকিয়ে সে মেয়ে তাদের পায়ের কাছে বসে গুন্‌গুনিয়ে গান গায় ঃ

মা গো, জম্‌মো দিলি এ সম্‌সারে মেয়ে করে,
ত্যাখন তো বললি না গো, আবাগী আমি অবলা ;
আজ য্যাতই কেন বাঁদিস্ না মা, (তবু) পান যারে চায়,
তার গলাতে পরাব আমি মালা।

নয় তো সাপের মত দুলে দুলে মোহিনী হেসে গায় ঃ

মুখের ছায়া জলের তলে, মনের ছায়া দেখি না-হায়—
আমার মনের ছায়া তোমার চ'কেতে,
হায়, পোড়া মন এত ঢাকি এত চাপি সব্বো অঙ্গ উদাস করে
তবু ঘোমটা ঢাকা পড়ে না মোর মনেতে।

গঙ্গার বুক থেকে হাওয়া উঠে সে গান ভেসে যায় পথ পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে জেলে পাড়ায়। হাওয়ার গায়ে সে সুর শুনে গাঁয়ের লোকেরা বলে, শ্মশানে বটগাছে শকুনবাচ্ছা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

সিধু হয় তো তাড়ি আনার নাম করে চলে যায়। অনেকক্ষণ ধরে আর আসে না। তারা দুজন এসে হয় তো দেখে, সিধু ঘরে না হয় বাঁধানো ঘাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কোন সময় ভূতেশ হয় তো খুব রেগে এসে মেয়েটির কাছেই সিধুর নামে

অভিযোগ করে, 'এ্যাই, একেই বলে মেয়েমানুষ নিয়ে শ্মশানে র‍্যালা চলে না। বললাম রাস্‌কেল, ষ্টুপিড ড্যাম ডোম ব্যাটাকে যে ছুটো গরু মরে গেছে আকালীর গোয়ালে। ভাগাড়ে কেন যাবে। তুই নিয়ে এসে ছাড়া, চামড়াটার দাম পাবি, কথার কথা বল্‌ছি—শকুনিগুলোরও পেট ভরে। পড়ে তো থাকবে হাড়টা। তাও দেখি, কতকগুলো ছোঁড়া আবার হাড় কুড়িয়ে বেড়ায়, কোথায় কোন্ ফ্যাক্টরীতে নাকি ছ'পয়সা সের বিক্রী করে। লোকসানটা কোথায়, বলতে পার ?'

মেয়েটি হেসে জবাব দেয়, 'এসব তোমরাই ভাল বোঝ ঠাকুরবাবু। চেলা তোমার সারাদিন তো তাড়ি খেয়েই পড়ে আছে। শ্মশান তো আগলাচ্ছি আমি আর ওই কুকুরগুলো।'

কখনো কখনো সিধুর মনে হয়, আর যাই হোক বামুনের ছেলে হয়ে ঠাকুর তা' বলে ডোমের ছোঁয়াও খাবে। কিন্তু বলতে ভরসা পায় না, তাই কায়দা করে বলে, 'জান্‌লে ঠাউর, আজ তোমার ইঞ্জিন সাহেবকে দেখলাম।'

'ইঞ্জিন সাহেবটা কে ?'

'তোমার দাদা গো, বড় হালদার।'

ভূতেশ বলে, 'ব্যাটাচ্ছেলে, ইঞ্জিনসাহেব বল্‌ছিস্ কি রে! বল এঞ্জিনিয়ার।'

'ওই হল।' একটু থেমে ট্যারা চোখে পিট্ পিট্ করে বলে, 'দাদা তোমার অতবড় মানুষ, আর তুমি বামুনের ছেলে হয়ে—'

'অনেক বড় রে, অনেক বড়।' ভূতেশ বলে ওঠে, 'ম'লে পরে এ শর্মার কাছে এসেই আমার লায়েক ভাইপোকে তার বাপ-ঠাকুর্দার নাম বলতে হবে।'

'কি বললে ?'

ভূতেশ বলে, 'তবে হ্যাঁ, কথায় বলে কেলে বামুন, কটা শুদ্‌দুর, বেঁটে মুসলমান—এ তিন ঘুঘুই সমান। আমি তো পোড়া কাঠ!'

কিন্তু সিধু আগের কথাটার রেশ টেনেই বলে, 'কি বললে ? তোমার ভাইপো'কে তার বাপ ঠাকুর্দার নাম তোমাকে বলতে হবে ?'

'হবে বৈ কি।'

'ভাইপোর ঠাকুরদা মানে তোমার বাপ তো ?'

ভূতেশ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'হলই বা। বাপ বলে তো খাতির নেই। আমি তো ডেথ্ মানে মৃত্যু রেজিষ্ট্রার।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সিধু তার ট্যারা চোখ তুলে বলে, 'আচ্ছা বল তো ঠাউর, তুমি মরে গেলে ওই খাতায় তোমার নামটা লিখবে কে ?'

জবাব দিতে গিয়ে থম্‌কে থাকে কিছুক্ষণ ভূতেশ সিধুর চোখের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ মুখে কোন কথা যোগায় না তার। তারপর লোমওঠা ভ্রূ তুলে বলে, 'আর তুই মরে গেলে তোকে পোড়াবে কে, বল্ দি'নি ?'

সিধুর ট্যারা চোখও হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে পিট পিট করতে থাকে। এক মুহূর্ত দু'জনেই তারা তাকিয়ে থাকে দু'জনের দিকে। তারপরেই মেয়েটি শুদ্ধ তিনজনেই তারা শ্মশান চমকে হাসিতে ফেটে পড়ে।

কিন্তু মেয়েটি আচম্‌কা হাসি থামিয়ে বলে ওঠে ভ্রূ বেঁকিয়ে, 'তোমাদের খালি এক কথা। মরা মরা আর মরা।'

সিধু বলে, 'তা মরা নিয়েই তো আমাদের কারবার। জ্যান্ত পাব কোত্থেকে ?'

এক বিচিত্র অভিমানক্ষুব্ধ গলায় মেয়েটি বলে, 'দেখতে পাওনা বুঝি জ্যান্তটাকে ?'

ব'লে চকিতে সিধু আর ভূতেশের দিকে চোখের দৃষ্টিতে মর্মঘাতী নালিশ জানিয়ে চলে যায়।

সিধু বলে, 'এ্যাই সেরেছে। কি হল রে ?'

ভূতেশ বলে বিড়বিড় করে, 'শালা! শ্মশানে মেয়েমানুষ! দেখিস ও ঠিক কেটে পড়বে।'

শীত যায়, বসন্ত আসে। বোল ধরে আম গাছে। ন্যাড়া বটগাছটায় গজায় পাতা।

ফাল্গুনের হাওয়ায় উদাস করে প্রাণ, গুটি দেখা দেয় গায়ে গায়ে— বসন্তের গুটি।

ভূতেশ রিপোর্ট দেয় পাড়াঘরের রোগের, আবার শ্মশানে এসে খাতায় মৃতের নাম পরিচয় লিপিবদ্ধ করে। ঝিম্‌-ধরা শ্মশান যেন আস্তে আস্তে আড়ামোড়া ভাঙ্গে। কুকুরগুলোর ঝিমুনি আরও বাড়ে, নেশায় যেন বুঁদ। কেঁদো হয় আরও বেশী। বটের শক্ত ডালে শকুনি গৃধিনী চঞ্চু ঘ'ষে ঘ'ষে করে শক্ত, সাপের মত চোখ নিয়ে গ্রামজনপদের দিকে তাকিয়ে খাবার খোঁজে।

কিন্তু বসন্তের ফাঁড়াটা অল্পেস্বল্পে কেটে গেলেও চৈত্রের শেষে ভূতেশের কথাকে বেদবাক্যি করেই যেন কলেরার মড়ক নেমে এল সারা চাকলা জুড়ে। ইস্! কি দুরন্ত তার বিস্তৃতির বেগ। রোগ ছড়িয়ে পড়ল যেন হাওয়ার দমকে দমকে। আর এ ফাঁকা গ্রাম নয়, শিল্পাঞ্চল। চটকল শহর। সারীবীজের মত ঘন বস্তী ও বাড়ীর ভিড়, তার চেয়েও বেশী ভিড় মানুষের, সরু সুড়ঙ্গের মধ্যে অগুন্‌তি পিঁপড়ের মত।

ওলাইচণ্ডী রক্ষেকালীর পূজো সুরু হল, সুরু হল পাড়ায় পাড়ায় অষ্টমপ্রহর নামকীর্ত্তন। হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছে সারা এলাকার অল্প ক'টা ডাক্তার, ফেঁপে উঠছে পকেটও। রোজগারের মরশুম এটা।

ভূতেশ তার খাতায় নতুন পাতা জোড়ে, পেন্সিল নিয়ে আসে নতুন। সময় নেই, সময় নেই, কেবলি মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু। শব শব শব।

চীৎকার, আর্তনাদ, কান্না। কান্না ভয়ের, আতঙ্কের, নিজের প্রাণের।

ভূতেশ বলল সিধুকে তার কটা খটাস্ চোখ তুলে, 'শালা সুরু হয়েছে, দে তো তোর সত্‌রঞ্চেটা চার পাট করে পেতে, একটু জমিয়ে বসি।'

সিধুও ক্লান্ত। চিতার আগুনের তাতে তাতে কালো হয়ে উঠ্‌ছে সে। বেড়ে যাচ্ছে তাড়ি খাওয়া।

মড়ার যেন পাহাড় জমে উঠ্‌ছে শ্মশানে।

সিধু মাঝে মাঝে খিস্তি খেউড় করে উঠছে, 'কে পোড়াবে অত মড়া? টান মেরে ফেলে দাও গঙ্গায়, ভাল গতি হবে।' তারপর মনে মনে ফিস্ ফিস্ করছে, 'শালা কাঠ কোথা? মানুষ দে মানুষ পোড়াতে হবে।'

বিড়িতে গাঁজা পোরার সময় নেই ভূতেশের। হাত চলেছে চলেইছে।

নির্লিপ্ত নির্বিকার চিত্রগুপ্ত। শোকে কেউ ফুঁপিয়ে উঠলে, কেঁদে উঠলে খ্যাক্ করে ধমকে ওঠে সে, 'ওসব ন্যাকামো রাখো, নাম বল। বাপের নাম? বয়স? রোগ?' একজন যায়, আরেকজন, আরো আরো। এক কথা, এক প্রশ্ন, নাম? বাপের নাম? বয়স? রোগ? বলে যাও, বলে যাও।

কুকুরগুলো মারলেও নড়ে না। শেয়ালগুলো দিনের বেলাতেই এদিক ওদিক করে বেরিয়ে আসছে ঝোপ ঝাড় থেকে। গঙ্গার ধারে ধারে শকুনের ভিড়। হাওয়ায় ভাসছে যেন কোন অশরীরী প্রেতিনীর একটানা কান্নার ঢেউ।

এখন পোড়ানো মানে আধপোড়ানো, আধপোড়ানো মানে চিতায় একবার শোয়ানো, কিংবা একই চিতায় কয়েকটা শব। কাঠ নেই, ছোট ছোট চিতা। সিধু মট্ মট্ করে মৃতের হাত ভেঙ্গে পা ভেঙ্গে কোন রকমে ঢুকিয়ে দিচ্ছে চিতার মধ্যে। কেউ বারণ করলে চেঁচিয়ে উঠছে, 'তবে পুড়োও এসে তুমি। দেখি, তোমার তাগদ। দেবে তো আট আনা কি চার আনা!'

হ্যাঁ, ক্রমাগত রেট কমে আসছে। কি ভূতেশের, কি সিধুর।

মেয়েটি মাঝে মাঝে যোগান দিচ্ছে ভূতেশ-সিধুর চা। একে তাড়ি, ওকে পুরে দিচ্ছে বিড়িতে গাঁজা। কিন্তু বাক্‌রুদ্ধ হয়েছে মেয়েটার, দম আটকে আসছে বুকের। আর তো সে পারে না! মড়া মড়া মড়া, কেবলি মড়া! আর ওই ভূতেশ ঠাকুর আর সিধু। সেই হাসি মস্করাই বুঝি সত্যি যে, ওরা চিত্রগুপ্ত আর যম। শুধু ওরাই জীবিত, নির্লিপ্ত, নির্বিকার।

কখনো ভূতেশ কখনো সিধুর চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে। শ্মশানের ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন তার মুখ। বাঁধা নেই বিনুনি, আঁচল ঘুরিয়ে লতিয়ে দেয়নি বুকে সাপের মতো।

ভূতেশ ও সিধু চোখাচোখি করে আর তাকায় মেয়েটার দিকে। তারপর ভূতেশ বলে, 'দেখেছিস্ একবার ওর চোখমুখ! ওরে, কেলেবামুন পোড়া কাঠ হলেও চিত্রগুপ্তের বেদবাক্যি! ও কাটল বলে।'

সিধুর গলা জড়িয়ে আসে। ঢুলুঢুলু ট্যারা চোখে তাকিয়ে বলে, 'এটা কাটবে, আবার আসবে।'

'ড্যাম ডোম কোথাকার!' ঘোড়ার মত লম্বা নাকের ভিতর থেকে ফঁ্যাস ফঁ্যাস করে শব্দ করে ভূতেশ। হঠাৎ গলার স্বরটা তার মোটা ও চাপা হয়ে আসে, 'আবার যদি এসব ফিকির করিস্ তবে তোর নামই আমি খাতায় উঠিয়ে ছাড়ব।'

অসীম ক্লান্তির সঙ্গে সিধু বলে, 'তা ঠাউর, ছনিয়াটা তো পেরায় খাতায় তুলে ফেল্লে।'

'যা বলেছিস্ সিধে। চিত্রগুপ্তের খাতাটা বড় সস্তা হয়ে গেছে।' বলে বিড়ি ধরায় সে।

এক একটা দিন কাটে না, যেন মাস কাটে। কিংবা বুঝি বছর।

হঠাৎ আকাশে মেঘ করে আসে, গুম্ গুম্ শব্দ ওঠে মেঘের ডাকের।

ঘরে ঘরে ডাক পড়ে, আয় আয় আয়, আয় বৃষ্টি আয়, নেমে আয়, নেমে আয়।

অপলক ট্যারা চোখে চালা থেকে সিধু এসে দাঁড়াল ভূতেশের সত্রঞ্চির সামনে। ভূতেশ তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। একমাত্র সে-ই জানে, প্রাণভরে বৃষ্টিকে সেও ডাকছিল কি না, নাকি ওই শকুনিগুলোর মত ভিজে ওঠা ঠাণ্ডা শ্যামল পৃথিবীতে অনাহারের গন্ধ শুঁকছিল, আকাশের দিকে মুখ করে।

সিধু বলল, 'ঠাউর কেটে পড়েছে ছুঁড়ি।'

'অ্যাঁ?' চমকে ফিরল ভূতেশ। যেন কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। পরমুহূর্তেই রেজেষ্ট্রি খাতাটার দিকে চোখ নামিয়ে বিড় বিড় করে বলল, 'শালা, বেদবাক্যি, বেদবাক্যি!'

গুরু গুরু গর্জনে প্রকম্পিত হয়ে উঠল আকাশ। তবু একটুও হাওয়া নেই, বদ্ধ গুমোট।

সিধু বলল ট্যারা চোখ ছোট করে, 'শ্মশানেও রেহাই নেই, মেয়েটা মরে গেছে গো ঠাকুর, ওলাওঠায়। বেদবাক্যি বটে তোমার।'

'মরে গেছে? ওলাওঠায়?' ভূতেশের কটা খটাস্ চোখের চারপাশে মাকড়সার জালের মত হাজার রেখা ফুটে উঠল। চালার দরজাটার দিকে তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল সে, 'এ কখনো আমার বেদবাক্যি নয়, কখনো নয়।' সিধু মেয়েটার শব এনে সামনে শুইয়ে দিল।

মরা মেয়ের এলানো চুল, নোংরা জামা কাপড়। আর সারা মুখখানি এক অপূর্ব শান্ত সুষমায় ভরা। আধবোজা চোখের পাতা দুটো খুলে দিলে বুঝি এখুনি সেই বিচিত্র লজ্জায় হেসে উঠে বসবে, হয় তো গুন্‌গুনিয়ে উঠবে, 'মাগো, জম্মো দিলি এ সম্‌সারে মেয়ে করে…'

ভূতেশ সিধু পরস্পর একবার চোখাচোখি করল। দু'জনেই তারা বোধ হয় কিছু বলতে চায় এ মেয়েটিকে নিয়ে। কিন্তু বলল না।

তারপর গম্ভীর মুখে ঠোঁট টিপে মৃত্যু রেজিষ্ট্রার কান থেকে পেন্সিল টেনে নামাল, আঙ্গুলের ডগায় জিভের থুথু লাগিয়ে পাতা উল্‌টে চলল। তারপর থেমে মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করল, 'ওর নাম কি?'

সিধুর ট্যারা চোখ ভাষাল না। বলল, 'কি জানি ঠাউর, মাগী বলেই তো ডাকতাম। তবে ওর মা ওকে ডাকত, কি বলে তোমার গে, সুলোচনা বলে।'

লিখতে গিয়ে ভূতেশের পেন্সিল আটকাল, যে পেন্সিল চিত্রগুপ্ত ভূতেশের কোনদিনই আটকায় নি। সুলোচনা!

তার হাতের পেন্সিল কেঁপে উঠল এই প্রথম। তারপর খস্ খস্ করে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে নামটা লিখে ভূতেশ ঠায় গঙ্গার দিকে চোখ কুঁচ্‌কে তাকিয়ে বলল, 'বলেই গেলি ড্যাম ডোম, সুলোচনা মানে জানিস্?'

সিধু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি জানি ঠাউর। অত মানে বুঝলে কি আর মড়া ঠ্যাঙ্গাই।'

ভূতেশ কয়েকবার খ্যাকারি দিয়ে চোখ বুজে বলল, 'সু-মানে সুন্দর, বুঝলি ব্যাটা? আর লোচনা মানে চোখ যার। অর্থাৎ সুন্দর চোখ যার।'

সিধু বলল মুখ ফিরিয়ে, 'হবেও বা। তা ওর চোখ দুটো তো—'

আবার মেঘ ডেকে উঠল। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে কালো হয়ে উঠেছে আকাশ।

'ওর বাপের নাম ?' পেন্সিল তুলল আবার ভূতেশ।

'জানি নে ঠাউর', বলে সিধু কাঠ কোপাবার কুড়ুলটা নিল তুলে।

'তবে, স্বামীর নাম ?'

কুড়ুলটা কাঁধে তুলে বলল সিধু, 'মিছিমিছি যদি লেখ, তবে—আমার নামটাই লেখ।'

ভূতেশের আঙ্গুল অযথা নড়ে উঠল। চোখ বুজেই বলল, 'আর যদি সত্যি সত্যি লিখি ?—'

'এত ন্যাকামোও তুমি জান ঠাউর !' বলতে বলতে সিধু সরে গেল।

দূর গঙ্গার জলের দিকে চোখ মেলে তাকাল ভূতেশ তার খটাস্ দৃষ্টি দিয়ে। ঠোঁটটা বেঁকিয়ে সে বিড়বিড় করতে লাগল।

'লিখব, লিখব, মিছিমিছিটাই লিখব চিত্রগুপ্তের খাতায়। কেবল—'

মরা মেয়ের মুখের দিকে তাকাল সে ! মনে পড়ল সেই প্রথম দিনের কথা, গঙ্গাজলের ছিটা আর পোড়াকাঠের প্রাণের মাতলামি। 'স্থলোচনা !'…ঠোঁট নড়ল তার। গলার পেশীগুলি ভিতর থেকে ঠেলে উঠল।—ফিস্ ফিস্ করে উঠল সে, 'ভূতেশ হালদারের খাতায় সত্য নামটা লিখব।'

ঘাড় গুঁজে এলোমেলোভাবে খসখস্ করে লিখে গেল সে। কি লিখল সে নিজেই জানে না বোধ হয়।

সিধু সব ঠিকঠাক করে চিতায় তুলে দিল মেয়েটিকে। তারপর আগুন ধরাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে ঘরে জমানো সব জামাকাপড়গুলো এনে চিতার উপর ফেলে দিয়ে আগুন ধরাল।

আকাশে আকাশে দুরন্ত মেঘের কলরব। হাওয়া উঠেছে, মেঘ ছুটেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। হয় তো বৃষ্টি হবে, কিংবা কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। ভেজা মাটীর সোঁদা গন্ধ বাতাসে।

শকুনগুলো উড়ে উড়ে গাছে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে, কুকুরগুলো জুলজুলে চোখে একবার আকাশ, একবার মাটী, একবার চিতাটার দিকে দেখছে।

ভূতেশ গিয়ে দাঁড়াল সেই বটতলার পুরানো ছাইগাদাটায়। সিধুও দাঁড়াল এসে। আজ আর মাঝখানে তাদের কেউ নেই। কেউ নেই অন্ধকারে বঙ্কিম চোখে আলো ফুটিয়ে, শরীরের রেখায় রেখায় প্রাণ-ভোলানো রূপের লহর তুলে গুন্‌গুনিয়ে ওঠবার, 'হায় আমার মনের ছায়া তোমার চ'ককেতে।......'

কেবল অস্পষ্ট ছায়ায় দুটো প্রেতমূর্তির মত গাঁয়ের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল তারা।

অনেকক্ষণ পর ভূতেশের মোটা গলা শোনা গেল, 'জান্‌লি সিধে, শ্মশানটা শালা সত্যি শ্মশান হয়ে গেছে।'

প্রতিরোধ

সেই আকালের দিনে কাঙাল কঙ্কালের মেলায় মনাই আর রাধার সঙ্গে সুবলের পরিচয়। তখন থেকে সবাই জানে সুবলকে—সে কবি-গায়ক। সেই থেকেই সুবল সকলের ভালবাসার ও শ্রদ্ধার পাত্র, সুবল সকলের আপনার।

আকাল গেছে, আবার মানুষ ভিটায় ফিরে এসেছে। আবার শুরু হয়েছে জীবনের গান—বাঁচার অভিযান। মনাই দাস ছাড়েনি সুবলকে। বলেছে, 'দুঃখের দিনে শান্তি দিছ, নিজে না খাইয়া খাওয়াইছ। তোমারে নি ছাড়তে পারি ?'

মনাই আবার বুক বেঁধেছে। পীতাম্বর সা'র সেই লম্বা মোটা খাতাটায় টিপ সই দিয়ে, টাকা নয়, নিয়ে এসেছে বীজধান। আবার পীতাম্বরেরই মাঠে লেগেছে ভাগচাষে।

সেই থেকে সুবল মনাইয়ের অতিথি। তা-ও আজ কয়েক বছর আগের কথা। পুরনো ঘা যেন শুকিয়ে আসছে। তবু সুবলের নিস্তার নেই। তার ডাক নিরন্তর। সেই আকালের গান তাকে অমর করে রেখেছে। যে অবুঝ শিশুরা আজ বড় হয়েছে, তারা সুবলের গানে জানতে পারে দেশে একদিন এসেছিল মন্বন্তর। সেই দুর্দিনের সাক্ষী থাকবে তার গান—মানুষের শত্রুদের সেই নিষ্ঠুর কাহিনী। সময় নেই, অসময় নেই। আজও মনাইয়ের বউ রাধা সুবলকে ধরে বসে, হেই গান গাও !

সুবল ধরে ঃ

শুন গো দেশবাসী, শুন মন দিয়া,
কহিতে পরাণ কান্দে, কান্দে আকুল হিয়া।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইল, মইল উলুখড়,
আশি ট্যাকা মণ চাউল হইল বাড়ল ধানের দর।
শুক্‌না মাঠ দৈত্যের মত হা' কইরা রইছে,
পানি দেওয়ার লোক নাই সব মরণ শয্যা লইছে,
কামারশালে আগুন নাই—হাপরে নাই টানা—
বাজারে নাই লোহা—কামারের পগটে নাই দানা।

শুনতে শুনতে রাধার মনে সেই পুরনো ঘায়ের পোকাগুলো যেন কিলবিলিয়ে ওঠে। সেই বিরাট ক্ষুধা, দুরন্ত প্রলোভন, দুনিয়ার সে কদর্য রূপ ভুলবে না সে কোনদিন। সুবলের গলা আরও করুণ হয়ে ওঠে ঃ

এমুন মহা মন্বন্তর জন্মে দেখি নাই
মায়ের বুকে সন্তান মরে এক ফোঁটা দুধ নাই।
ছিটাল কাটালের ভাত লইয়া মায়ে পুতে ঝগড়া
(ও হরি কইমু কি) সন্তানেরে ফাঁকি দিয়া, করে পচা অন্নের বখ্‌রা।

'কিন্তুক্ ব্যাপারডা কি জানেন নি আপনারা ?' বলেই ঠাস্ ঠাস্ করে হাততালি দিয়ে গেয়ে উঠত সে,

নোটের গোছা বান্ধে গেঁজে হাইসা চোরা ব্যাপারী,
ও হরি মাথা খাও, পিছা মারো এমন আড়তদারির।
প্যাটের জ্বালায় পোলা মরে, বস্ত্র জ্বালায় মা দেয় গলায় দড়ি,
হায়রে—পেট কাঁপাইয়া, দাঁত দেখাইয়া, হাসে ড্যাক্‌রা চোরাকারবারী।
চক্ষের জলে বুক ভাসে ভাই কইতে দুঃখের কথা,
হাইয়ো সুবল সাধুর সাথে সব কও—দূর কর এই অরাজকতা।

শুধু এই আহ্বান জানিয়ে তৃপ্তি পায়নি সুবল। মানুষের আর নিজের দুঃখ তাকে এমনই নির্মম করে তুলেছিল যে, সে মানুষের শত্রুদের আঙল দেখিয়ে গেয়েছে ঃ

রহিম চাষী মনাই চাষীর ক্ষয় ধরে গো হাড়ে
আড়তদার রঘুসাউ গুদামে বইয়া চাউলের পোকা ঝাড়ে।

ও-ভাই চাউলের বস্তায় পচানি ধরেছে ;
সোনা মিয়ার আড়তে ভাই বস্তা নাহি ধরে,
ও ভাই—কলিরাজা মরণ বাড় বেড়েছে।

এ গান শুনে স্থানীয় দারোগাবাবু তাকে আচ্ছা করে ধমকে দিয়েছিল। বলেছিল, গাঁয়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এ গান গাওয়া চলবে না। কিন্তু আর আর মানুষগুলো চাষা বলেই নাছোড়বান্দা। তারা সুবলকে নিয়ে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে টানাটানি করে, বসায় গোপন আসর। তাই মনাইয়ের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পেয়েছে সে। রাধার প্রিয় সহচর সুবল।

মনাই সারাদিনই থাকে কাজে কর্মে। সুবল আর রাধা সারাদিন বসে বসে গান বাঁধে, গান গায়—গল্প করে।

রাধা আর সেই কঙ্কাল রাধা নেই। গায়ে মাংস লেগেছে, দেহের রেখায় রেখায় ফুটেছে উদ্দীপ্ত যৌবনের ধার। যেন সেই আগের রাধা। সেই আয়ত চঞ্চল চোখ, পাতলা চাপা ঠোঁট, স্ফীত যৌবনের গরিমায় উদ্ধত বুক।

সুবলের বড় সাধ রাধার ওই রূপকে সুরের মায়া দিয়ে জড়িয়ে রাখে—একটি গান বাঁধে। কিন্তু লজ্জা করে, সঙ্কোচ লাগে সুবলের। না জানি রাধা কি ভাববে। হয় তো তার সুবল-সখার ওপর রুষ্ট হবে। রাধাকে দুঃখ দিতে পারবে না সে। কিন্তু রাধার জিভের বাক্ নেই। সে একদিন বলেই ফেলে, 'আমারে চাইয়া চাইয়া দেখ, আর নিঃশ্বাস ফেলাও ক্যান্? কিছু কওনা যে?'

সুবল লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। পরমুহূর্তেই হেসে বলে, 'তুমি হইলা আমার সখার বধূ, তোমারে দেখুম না—দেখুম কারে! দুইটা চোখ ভইরা খালি তোমার রূপই দেখি আর ভাবি—কালার মনমোহিনী রাইমণিও কি এমুনই আছিল?'

রাধা মিষ্টি গলায় খিল খিল করে হেসে ওঠে। 'হ, তুমি হইলা কবি, তোমার লগে নি মাইন্‌ষে কথায় পারে?'

সুবল বলে, 'কিন্তুক্ তোমার ওই রূপের ধারে আমার মুখে ক্যান্ কথা আটকাইয়া যায়?'

—'রূপ না ছাই'! রাধা ঘাড় ফিরিয়ে বাঁকা চোখে হেসে চলে যায়। সুবল তাড়াতাড়ি একতারাটা পেড়ে গান ধরে ঃ

ও সখি তোমার রূপের আলোয় আলো পড়ে আমার চোখেতে
কালো ভোম্‌রা পাগল হইল, পুইড়া মইল, তোমার রূপেতে।
ও বঙ্কিম নয়ন তুইলা আমার পানে চাইও না
কালসাপিনী মনমোহিনী কেশ তুলাইও না,
ওই হাসি দিয়া ভুলাইও না এই মিনতি করি তোমার পায়েতে।

গান শেষ করে সুবল রাধার অভিনন্দনের জন্য হাসিমুখে বসে থাকে। একটা গভীর তৃপ্তির আবেশে চোখ জড়িয়ে আসে তার। এমন তৃপ্তি সে পেয়েছিল মন্বন্তরের গান বেঁধে। এমন তৃপ্তি পেয়েছিল যাত্রার দল থেকে বেরিয়ে প্রথম যেদিন সে একতারাটা নিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার গান-মুগ্ধ লোকেরা বাবাজী বলে যখন তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বলেছিল, 'নাম আমার সুবল সাধু!' লোকে বলেছিল, 'বিনয়ের অবতার! তা—কুঠাইকার সাধু গো? গয়া না কাশীর?'—এ ঠাট্টার কি সুন্দর জবাব দিয়েছিল সুবল। 'আহা!'—গেয়েছিল—

রসিক জনে ঠাট্টা করেন দেইখ্যা জনম তুখীরে
শুইনা হাসেন সাধু পরিচয়—
ও হরি—কইয়া দেও তোমার জনম সুখীরে;
সাধু মাঝে চোর বাটপার ব্রহ্মচারি নয়!

এ গান শুনে চারিদিক থেকে সেই সাধুবাদ, সেই অভিনন্দন ভুলবে না সুবল। সুবলের বাল্যগুরু কমরুদ্দিন ফকির। সে তাকে ডাকত, সুবল সাধু। তাই সে এই পরিচয় দেয় লোকের কাছে। আজ রাধাকে নিয়ে যে গান সে গাইল—তা বড় আকস্মিক। তৈরী না করেও এ গান তার সর্বাগ্রে আপনিই এসে গেছে।

কিন্তু রাধা গেল কই? গান শুনে তো সে কিছু বলতে এল না! হয় তো লজ্জা পেয়েছে। সুবল রান্না ঘরে গিয়ে উঁকি দেয়। রাধা নেই। ঢেঁকি ঘরে দেখে সেখানেও নেই। গেল কোনখানে? সুবল বাড়ীর পিছনে আসে।—

হ'—হাসতেছে বুঝি ? কামরাঙা গাছের গোড়াটায় বসে বসে যেন হাসির দমকে দমকে ফুলছে। সামনে গিয়ে সুবল আড়ষ্ট স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। একি—কাঁদছে! ব্যগ্র গলায় প্রশ্ন করে সে, 'কি হইল সখি, আমার গান শুইনা দুঃখু পাইছ ?' কান্নার আবেগে রাধা কথা বলতে পারে না। কী এক পুঞ্জীভূত বেদনার অশেষ কান্নায় যেন সে ভেঙে পড়েছে। ক্ষোভে-দুঃখে সুবলের বুক ভরে ওঠে। গান গেয়ে সে দুঃখ দিল তার সখিকে ? বিস্মিত ক্ষুব্ধ প্রশ্ন জমাট বেঁধে ওঠে তার মনে। বলে, 'আমি না জাইনা গাইছি সখি, আমারে ক্ষমা কর। তোমারে তো আমি দুঃখ দিতে চাই নাই !'

চোখ মুছে রাধা কান্না জড়ানো গলায় বলে, 'তোমার দোষ নাই, আমারই কপাল মন্দ। এই রূপ দিয়া কি করুম সখা, ধুইয়া জল খামু ? এই রূপ দেইখা তোমার বন্ধু শান্তি পায় না।'

আবার অশ্রুর বন্যা আসে রাধার চোখে। সুবল বিস্মিত প্রশ্ন করে 'ক্যান্ ?'

রাধা বলে, 'তুমি কি দেখনা, তোমার বন্ধু আমার লগে কথা কয় না। আমারে য্যান্ ঘিন্না করে। আমারে আর ভাল লাগে না তার। তবে আর এই পরাণের কি দাম আছে, কও ?'

—'হ।' সত্যিই তো, সুবল কিছুদিন থেকে দেখছে মনাই যেন কেমন আনমনা। কাজ-কর্মের পর বাড়ীতে গুম্ হয়ে বসে থাকে। কথাবার্তা নেই, কেমন চিন্তিত ব্যথিত উদাসীন।

—'কিন্তুক্ ক্যান্ সখি ?' সুবলের বড় অস্বস্তি লাগে।

—'আমার এই পোড়া রূপই সার—মাকাল ফলের বাহার। এই রূপের কথা শুনলে পরে আমার বড় কষ্ট লাগে।'—কান্নার আবেগে রাধার গলা প্রায় বন্ধ হয়ে আসে।—'তোমার বন্ধু···আমার কাছ থেইক্যা···একটা পোলা চায়।' বলতে হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে যেতে চায় রাধার।—'কিন্তুক্—আমার যে পোলা হইব না গো ! আমি যে—'

বন্ধ্যা কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে ডুক্‌রে ওঠে সে। সুবলের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। আহা ! সত্যিই তো। রাধা আর মনাইয়ের এতবড় দুঃখের

কথাটা তো কোনদিন ভেবে দেখেনি সে! মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারে না সে রাধাকে। আনমনে একতারাটার তারে ঘা দেয় সে। এর কোন প্রতিকার তো জানা নেই তার। এ তো স্বয়ং ভগবানের হাত, মানুষের সৃষ্টিকর্তা তিনি! দীর্ঘ নিশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে সুবলের বুক। বলে, 'কাইন্দো না। কি করবা, মাইন্ষের হাত নাই এইতে। কামনা করি তোমার য্যান্ ঘর-ভরা পোলাপান হয়।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে সে:

প্রভু অবুঝ মোরা, বুঝি না তোমার রঙ্গ হে!
মা করিয়ে গড়েছো যারে দিয়েছো এতেক রূপ,
তবু শূন্য বুক, শূন্য গর্ভ এ তোমার কেমন রঙ্গ হে?

এমন সময় আসে মনাই। বড় ব্যস্ত মনে হয় তাকে। সঙ্গে তার আরও অনেক লোক—শ্রীশ, ফকির, মধু, হেম, মানু অনেকে। ব্যাপারটা কি? সুবল এগিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে মানুকে, 'ব্যাপার কি তোমা'গো মানু?' মানু রহস্য-জনক ভাবে হাসে। সুবলের কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলে ফিস্ ফিস্ করে।

—'হ? অহন কি কামার-বাড়ী যাইতেছ?' সুবলের মুখ বিস্মিত-হাস্যে ভরে ওঠে।

—'হ। তোমারে কিন্তু গান করিতে হইব, সাধু!' মাথা ঝেঁকে হেসে বলে মানু।

—'আরে নিচ্চয়, নিচ্চয়।'

চিঁড়ে-মুড়ির পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে আসে মনাই। সুবলকে বলে, 'হেই কাইল লাগাৎ ঘরে ফিরুম, বোঝলা সাধু? চলি।'

চকিতে ঢেঁকি-ঘরের পাশে রাধার ব্যাকুল-জিজ্ঞাসু মুখের দিকে একবার কটাক্ষ করে আবার বলে সে, 'ডর নাই। কামার-বাড়ী যাইতেছি। কাম রইছে মেলা।' সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে।

পরদিন ভোরবেলা রাধা উঠোন নিকোতে নিকোতে বোধ হয় মনাইয়ের

দুর্ব্যবহারের কথা মনে করেই চোখের জল ফেলছিল, আর সুবল একতারাটার তারে আনমনা খেয়ালি হাতে ঘা দিচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ চতুর্দিক গম্ গম্ করে ওঠে ঢাকের শব্দে। চকিতে রাধা খাড়া হয়ে ওঠে, থর্ থর্ করে কেঁপে ওঠে তার সর্বাঙ্গ। জলে ভেজা চোখে তার শঙ্কা না পুলক···বোঝা যায় না। মনাইরা কি তা হলে সত্যি সত্যি শুরু করলে ?

আচম্কা থেমে যায় সুবলের হাত। চোখ দুটো তার চকচকিয়ে বড় হয়ে ওঠে! তা হলে শুরু হল ? তারা দুজনে ছুটে গিয়ে ওঠে দাওয়ার ওপর। তাকায় মাঠের দিকে।

হ্যাঁ, সত্যিই শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে—তাই পাগলা ঘোড়ার মত ছুটোছুটি করছে পীতাম্বর সা। বুক চাপড়াচ্ছে, শাসাচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে একটা অসহায় ক্ষেপা কুকুরের মত।

সরু আল পথ বেয়ে দলে দলে নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ জমা হয়েছে। ঘিরে রেখেছে, ব্যূহ রচনা করেছে পাকা ফসলের মাঠ ঘিরে।

বিসর্জনের বোল ভুলে গেছে ঢাকিরা। উৎসবের পাগলা মাতনের বোল যেন কথা কইছে ঢাকের পিঠে।

জীবন ভর পেটের জ্বালার পরিসমাপ্তি করবে আজ তারা। তাই আজন্ম ক্ষুধার্ত আর ম্যালেরিয়া রোগীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে মাঠে। নিজেদের পেটের দানা আজ তারা কেড়ে নেবে। লড়াই তারা করবে, প্রাণ তারা দেবে, তবু ঘাড় থেকে তারা ঝেড়ে ফেলবে—বহুদিনের সঞ্চিত সমস্ত ঝামেলা, কাঁটার বোঝা।

গভীর উত্তেজনায় রাধা সুবলের একটা হাত চেপে ধরে। সুবল ভাবছে, শ্রীশ, মধু, হেম, ফকির, মানু, মনাইদের কথা। রোগা ক্ষীণজীবী ঝগড়াটে স্বার্থপর মানুষগুলির মধ্যে প্রাণের এত আবেগ! এরা সেই তারা—যাদের সম্বন্ধে সুবল কতদিন গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে বলেছে,—ভগমান! তোমার রাজ্যে মানুষকে আঁধিয়ার করেছে কে ?

কিন্তু আজ একি দিন এল ?

সুবল একতারাটা নিয়ে মাঠের দিকে পা বাড়ায়। কি গান গাইবে সে আজ! আজ তো তাকে গাইতে হবে ঢাকের তালে তালে!

গাঁয়ের ধারে ধারে ভিড় করা মানুষগুলোর চোখে যেন কি এক উল্লসিত স্বপ্নের ছায়া নেমে এসেছে!

সুবলের মনে পড়ে মনাইয়ের কথাগুলি: জোতদারের ঘরে এবার অর্ধেক ফসল তারা তুলে দিয়ে আসবে না। তিন ভাগের দু ভাগ তারা নেবে, এটা হক—ন্যায্য প্রাপ্য। বলে, 'সবই তো আমাগোর। পীতাম্বরের আছে কি? তার বাপ ঠাকুর্দা জমি কিনা রাখছিল, হের লেইগা অর্ধেক ধানে তার হক থাকব নাকি? বীজ-ধানের থেইক্যা শুরু কইরা—ভিজা পুইড়া হালার আমাগো পরাণ শুকাইয়া গেল—আর আধ্ বখ্রা দিমু তারে! ক্যান্? মরুম? দেনায় জমি গেছে, ভিটা গেছে আর আছে কি?'

রাধা বলত একটা মিঠে বোকাটে কটাক্ষ করে, 'এইডা তো জগতের নিয়ম! ভাগে কাম করনা তোমরা?'

মনাই যেত চটে। বলত, 'তুই চুপ থাক্ দেহি! চির দিনই এই অনিয়ম অনাচার থাকব নাকি? আমাগো হক নাই এট্টা? আমরা কি গরু?'

—'হা, হাচা কথা কইছ ভাই।' সুবল সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করত মনাইকে,—'আমাগো হক আছে, হেই কথা ভাবব কেডা আমরা না ভাবলে?'

তাকে আসতে দেখে সবাই চীৎকার ক'রে ওঠে—'সাধু আইও, কবি আইও!'

সুবল একেবারে মাঝখানে এসে ঘাড় কাৎ করে, গালে একটা হাত দিয়ে সুর দেয়, 'হা-আ আ-হা-রে…'

ঢাকিরা এগিয়ে আসে সুবলের কাছে। সুবল ধরে ঢাকের তালে তালে:

হায়—একি ঘটন ঘটল কলির রাজ্যে
মরা মাইন্ষের হকের লড়াই—
ঢাকের বোলে বাজ্ছে!

ধান কাটতে কাটতেই সবাই ধূয়া দিয়ে ওঠে: 'হায়—হায় রে!'

সুবলের বুকের মধ্যে দুলে ওঠে। এক উন্মত্ত নেশায় যেন পাগল হয়ে ওঠে

সে। ঢাকের তালে তালে তাকে নাচতে দেখে ঢাকিদের মগজেও যেন কেমন নেশা চেপে যায়। তাদের কোমর দোলানি শুরু হতে থাকে আস্তে আস্তে—সারা দেহ এঁকেবেঁকে ওঠে সাপের মত।...সুবল আবার ধরে ঃ

আমার খুনের দানা কাইটা লমু মানিনা হুকুমদারি
কলিজার খুনের পরদায়—প্রাণ-বাঁচামু সত্য-যুগের হক্‌দারি।

—'হায় হায় রে!' ধারালো কাস্তের দুরন্ত বেগের সঙ্গে ধুয়া দিয়ে ওঠে সবাই।

সারাটা বেলা সুবল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও বাকী নেই। সারাটা পরগণা জুড়েই পড়েছে ধান কাটার পালা। শহরে দেখা সেই মেশিনের মত সবাই একযোগে নেমে পড়েছে মাঠে। সুবলকে অভিনন্দন জানায় সবাই। পরগণার প্রাণ সুবল। তাদের এই অভিনব নতুন দিনে সমস্ত ত্রাসটুকু সুবল যেন নীলকণ্ঠের মত গিলে নিয়েছে। তাই অসহ্য ভাষার আবেগে সুবলের জিহ্বা চঞ্চল, কণ্ঠ ক্লান্তিহীন।

অন্ধকার ঘোর হয়ে আসে। বাড়ী ঢুকতেই সুবল শুনতে পায় মনাই বলছে, 'জলটুকু খাইয়া ফেলা রাধা। মহেশ ঠাকুরের পড়া জল, মা ষষ্ঠীর চরণ ধোয়া। এর লেইগা হেই নিমাইহাটা গেছিলাম। কপালে যদি থাকে!' বিস্মিত রাধা বলে, 'হ? নিমাইহাটা গেছিলানি? হা আমার পড়া কপাল!' একটা সশব্দ দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে তার।

সুবলও কম বিস্মিত হয় না। এর মধ্যে ধান কেটে মনাই নিমাইহাটা ঘুরে এসেছে! হতাশায় নুয়ে পড়া মনটায় তার এত আশা, এত অনুপ্রেরণা কোত্থেকে এল?

—'নে—খাইয়া ফেলা। আর বাতাস লাগাইস্ না।' বাইরের হাওয়া লেগে পড়া জলটুকুর মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে মনাই বলে। রাধা আর দ্বিরুক্তি না করে ঢক্ করে খেয়ে ফেলে জলটুকু।

অন্ধকার উঠানে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে সুবল যুক্ত কর কপালে ছোঁয়ায়।

কিছুদিনের মধ্যে ধানকাটা প্রায় শেষ হয়ে আসে। সুবলের ডাক পড়ে

এখানে। তাকে নিয়ে মাতে সবাই ধানকাটার গানে, শোনে তাদের বোবা মনের অবোধ্য, অব্যক্ত ভাষা—সুবলের গলায়।

কিন্তু সুবলের চোখে মুখে একটা বিস্ময়ের ঘোর যেন সদাই লেগে আছে। সে রাধাকে দেখে আর থম্‌কে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে। ব্যাপারডা কি? এট্ট য্যান্ কেমুন্ মনে হয়? হ!

কিন্তু বলতে পারে না কিছু। লজ্জা হয়, সঙ্কোচ হয়, দ্বিধা আসে মনে। হয় তো তা নয়। তবু এমন স্পষ্ট হয়ে ঠেকে সুবলের চোখে—যে সে নিজেকে আর অবিশ্বাস করতে পারে না। একদিন বলেই ফেলে, 'এট্টা কথা কমু সখি, অপরাধ লইও না।'

রাধার মুখে হঠাৎ কেমন লাল্‌চে ছোপ ধরে যায়। লজ্জিত জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় সে সুবলের দিকে। সুবলের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বেশ দৃঢ় ভাবেই বলে, 'তোমার পোলা হইবে সখি!'

হঠাৎ যেন একটা ভারী জিনিসে ধাক্কা খেয়ে রাধা কেঁপে উঠে টলতে থাকে। চোখ দুটো বুজে আসে। পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সুবল ধরে ফেলে তাকে তাড়াতাড়ি। —'কি হইল রাধা?'

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। একটু পরেই রাধা আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তবু চোখের পাতা তার এত ভারী হয়ে এসেছে যে সে সুবলের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। কয়েক মাস ধরে যে সন্দেহ সে মনে মনে গোপনে পোষণ করে আসছে, তাকেই দ্বিধার সঙ্গে প্রকাশ করে, 'বোধ হয়!'

সুবলের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—'বোধ হয় না, তাই। এ আর কিছু না। তুমি নিজের দিকে চাইয়া দেখ না নাকি—আঁই? তা নাইলে'—তার উৎসুক দৃষ্টিটা রাধার কটি-বন্ধনের কাছে গিয়ে থেমে যায়। বলে 'কতদিন থেইক্যা?'

—'প্রায়···চার-পাঁচ মাস। আমার কিছু—' রাধার মুখে আর কথা ফোটে না। এত অসম্ভব লজ্জাবতী সে কবে থেকে হল!

সুবল কপাল চাপড়ায়—'হা পোড়া কপাল! এই পাঁচটা মাস তুমি মনাইরেও কিছু কও নাই?'

রাধার ঘর্মাক্ত হাতটা ছেড়ে দিয়ে সে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'মনাই···মনাইহে! মানুষডা গেল কুনঠাঁই?'

উচ্ছ্বসিত হয়ে বেরিয়ে পড়ে সে বাইরে।

রাধা চকিতে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে—কোমর থেকে কাপড়টা খুলে ফেলে। নিজের সামান্য স্ফীত জঠর সে মুগ্ধ বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করতে থাকে। আল্‌তো ভাবে খুব সাবধানে গভীর মমতায় হাত বুলোয়। হ, ক্যামুন য্যান লাগে! গভীর সুখে তার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। সে আজ বিজয়িনী, সে আজ সত্যি গরবিণী। কারুর চেয়ে কোন অংশে কম নয় সে। তার ইচ্ছে করে পেটের উপর কান পেতে শোনে তার সমাগত সন্তানের হৃৎস্পন্দন। কিন্তু তা হবার নয়। না হোক—সে স্পষ্ট অনুভব করে তার মধ্যে রয়েছে আর একটা মানুষ—ছোট্ট—এইটুকু।—তার মনাইয়ের সন্তান—রাধার সন্তান!

গভীর সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে সে। সত্যিই তো মানুষটা গেল কুনঠাঁই? সে কি জানে না রাধা তার সন্তানের মা হতে চলেছে? বাড়ীর বাইরে এসে সে মাঠের দিকে তাকায়। হ,—মাঠের উপর অনেক লোকজন জমা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে! ব্যাপারডা কি? এক পা এক পা করে এগোয় সে।

ও! সভা ডেকেছে পীতাম্বর সা, সোনা মিয়া, জহুরুদ্দিন—সব জোতদারেরা। ক্যান? দেশের অমঙ্গল হয়েছে, সর্বনাশ ডেকে এনেছি আমরা? অর্ধেক পথ থেকেই ফিরে আসে রাধা। মানুষডা হেই ঢ্যামনাগো কথা শুনছে বুঝি?

পোড়া কপাল!

পেছন পেছন সুবল আসে হন্তদন্ত হয়ে।

—'শোন শোন সখি, এট্টা কথা শোন!' খুশি উপ্‌চে পড়ে তার গলায়—'বড় ভাল কলি মনে আইছে, শোন দেহি!' গুন্ গুন্ করে ধরে সে ঃ

তা না না—না—না—রে—
পরাণ ছেঁচিয়া সোনা তুলিল নিজ ঘরে,
সোনায় আনিল সোনা মলিনার গর্ভে—

জননীর হাসিতে মা লক্ষ্মীগোলা ভরে।
অঘটন নয় হে সখি—শোন সখার কথা—
ভণ্ড কলি পরাস্ত, হাসি খুশি মুক্ত বটে স্বরগের দেবতা !···

রাধা বিস্মিত শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে ওঠে—'হ, বড় মানানসই গাইছ কিন্তুক্ সখা। পরান ছেঁচিয়া সোনা তুলিল নিজ ঘরে—বড় হাচা গান গাইছ।'

সুবল মুচকে হেসে বেমক্কা জিজ্ঞাসা করে ফেলে, 'কেউরে খুঁজতে আইছিলা নাকি সখি ?'

—'উঁহুঁ !'—রাধা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

সুবল গম্ভীর হবার চেষ্টা করে।—'আমি ভাবলাম বুঝি কোন মানুষরে খুঁজতে আইছ! তা—' হঠাৎ চোখাচোখি হতেই উভয়ে অজস্র হাসির আঘাতে ভেঙে পড়ে।

—'যাঃ ফাজিল কুনঠাঁইকার !'

কুটিল কটাক্ষ হেনে রাধা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। পদক্ষেপের চঞ্চল বেগে তার সর্বাঙ্গ দুলে দুলে ওঠে, নেচে নেচে ওঠে। তার দোলায়মান দেহে ফুটে ওঠে মত্ত নাচের ভঙ্গি, হৃদয়াবেগের দৈহিক প্রতিচ্ছবি। সুবল গেয়ে ওঠে ঃ

জনম তপস্যা তব সফল হইল গরবিনী
হেলিয়া দুলিয়া চলে স্বামী-সোহাগিনী।
আহা—হেলিয়া দুলিয়া চলে –

গান শেষ করে বলে, 'বন্ধুর আসতে কিন্তু দেরী হইব সখি। তাগো সমিতির ঘরে নাকি সভা হইব !'

রাধা ক্ষুব্ধ হয়। 'হ,—মানুষটার য্যান্ দিশা নাই। সমিতি আর সভা, এত ল্যাঠা ক্যান্ ?' সুবল বুঝতে পারে রাধার অভিমান! অপরাধটা গায়ে পেতে নিয়ে ওর মনের কথাটাই সে প্রকাশ করে দেয়,—'একটা গোলমাল হইতে পারে, হামলা হইব বইলা মনে হইতেছে।'

রাধা চমকে ওঠে—সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীর আশঙ্কা তা হলে সত্যি

সুবল রীতিমত গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে, 'সখি এই দুনিয়ায় মানুষের কিছুতে হক কাড়তে হইলে পরাণ দিয়া লড়তে হয়। সোয়ামী তোমার হকদারির যোদ্ধা—লড়াই শেষ করতে হইব না তারে ?'

—'হ।' রাধা স্বীকার না করে পারে না।

পীতাম্বর সা-র সভা শেষ হয়। লোকজন ফিরতে থাকে রিক্ত মাঠের ওপর দিয়ে। রাধা ঘরে যায়। সন্ধ্যা দিতে হবে।

সুবল কেমন উদাস হয়ে যায়—দিগ্‌দিগন্তহীন শূন্য মাঠের দিকে চেয়ে। সমস্ত ফসল কাটা হয়ে গেছে, শুধু চোখে পড়ে এখানে সেখানে জল-ঘাসের হেলানো মাথা, বিলের কচুরি পানার উত্তোলিত ডগা বিরাট বিল জুড়ে ছাওয়া। ...আবার আসবে পৌষ, কাটা হবে ফসল, সকলের গোলা হবে ভরতি। অনাহার নয়, দেনা নয়, রোগ নয়, মৃত্যু নয়, মা লক্ষ্মী থাকবে ঘরে বাঁধা। আর আবার রাধার দেহে নতুন সন্তান সম্ভাবনা হয় তো ফুটে উঠবে রেখায় রেখায়। আহা মানুষের সে জীবন কী সুন্দর—না জানি কেমন !

ক্রমশ রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। রাধা বলে ঃ 'সন্ধ্যা বাতি দিতে গিয়া আমার হাত থেইক্যা ধুপ্‌তি পইড়া গেছে। সখা, কেমূন করিতেছে মনডা। তোমার বন্ধুরে একবার ডাইকা লইয়া আহ !'

দ্বিরুক্তি না করে সুবল বেরিয়ে পড়ে। খানিকটা যেতেই দেখে—দক্ষিণের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। আর একটু পরেই দাউ দাউ করে ওঠে লেলিহান আগুনের শিখা। ভেসে আসে একটা চাপা আর্তনাদ-কোলাহল। কার বাড়ীতে আগুন লাগল ? এগোবার উপক্রম করতেই হঠাৎ একটা শব্দে চম্‌কে সে রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। কে যেন আসছে ! কিন্তু লোকটা সুবলের সামনে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে। রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কে ?'

মনাইকে চিনতে পেরে সুবল সামনে আসে। বলে, 'আমি সুবল, ব্যাপার কি ?'

—'আইছে, তারা আইয়া পড়ছে। আগুন লাগাইয়া দিছে সমিতির ঘরে। চল—ঘরে চল !' কেমন ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ শোনায় মনাইয়ের গলা।

বাড়ী এসে কিছু চিড়ে মুড়ি বেঁধে নেয় সে কাপড়ে। সব শুনে রাধ সমস্তাই ব্যবস্থা করে দেয়।

—'হুলিয়া বাইরইছে আমাগো, বোঝলানি? নিমাইহাটার বংশী মণ্ডলের বাড়ীতে চললাম রাধা। দেখিস, পারবি তো?'

রাধা গর্জে ওঠে, 'আমি শিবদাস মোড়লের মাইয়া না? ধান কাড়বনি আমার কাছ থেইক্যা? কত মায়ের দুধ খাইছে ঢ্যামনারা দেইখ্যা লমু। তুমি যাও গা—দেরী কইরো না।'

সুবল কোথাও যেতে অস্বীকার করে। মনাইয়ের কানে কানে বলে, 'তোমার বউ যে পোয়াতি, আমারে দেখতে হইব না?'

—'হ?' মনাই ও আবার বেঁকে বসে। বলে, 'তবে আর যামু না। পরাণ দিতে হয়—এইখানেই দিমু।'

কিন্তু রাধা দৃঢ় গলায় আপত্তি জানায়—'তোমারে ধইরা লইয়া যাইব যে? তুমি থাকতে পারবা না—যাও!' জোর করে সে মনাইকে সরিয়ে দেয়।

তারপর সবাই রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করে থাকে। সমস্ত গ্রামটাই প্রতীক্ষা করে থাকে অনিবার্য লড়ায়ের দৃঢ় প্রতিরোধের জন্য। শত্রুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে সবাই। জান কবুল, তবু ধান ছাড়বে না কেউ। এ তাদের অভাব-অনটন রোগ-শোককে ছাড়িয়ে বাঁচার অভিযান।

রাত্রি ভোরেই হঠাৎ ওঠে আর্ত কোলাহল। এসেছে, শত্রু এসেছে! ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে সুবলের ধাক্কা লেগে একতারাটা পড়ে যায়। যাক যাক। চকিতে একবার সেদিকে দেখে সে বেরিয়ে পড়ে।

ডুকরানি শুনে শ্রীশের বাড়ীতে ঢোকে সে!

সব শেষ করে দিয়েছে! শ্রীশের বউ পড়ে আছে উঠানে—গালের কশ বেয়ে রক্ত ঝরছে তার। ঘরের সমস্ত ঘটি-বাটি-কাঁথা লণ্ড-ভণ্ড হয়ে আছে উঠোনের ওপর।

—'পুলিশের লোক আমার মায়েরে মাইরা ফেলাইছে।'

সুবল চকিতে ফিরে দেখে শ্রীশের বারো বছরের ছেলে গোলার কাছে মায়ের উপর প'ড়ে চীৎকার করছে, 'মা···মা গো!'···

সুবলের বুকের মধ্যে কান্না ঠেলে আসে। ছুটে বেরিয়ে আসে সে।

—'সাধু···সাধু···'

সুবলকে ডাকছে রহিমের বড় মেয়ে। রহিমকে মেরে ফেলেছে ওরা। জমাট বেঁধে উঠেছে তাজা রক্ত রহিমের পাঁজরায়। রহিম! রহিম! কবি সুবলের দাঁতে দাঁত চেপে বসে যায়। নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে তার পদক্ষেপ। এ লড়াই কি শেষ লড়াই!

—'মাইরা ফেলাইল গো···বাঁচাও!'

উলঙ্গ মান্নুর বউকে তাড়া করে আসছে পশুর দল।

—মার—মার···

বহু দূর থেকে মেয়েরা ছুটে আসছে দা কুড়ুল লাঠি ঝাঁটা যা পেয়েছে তাই নিয়ে। সর্বাগ্রে রহিমের বউ—হাতে কাটারি! আশ্চর্য! একদিন পেটের জ্বালায় রহিমকে ছেড়ে না সে অপরকে নিকা করেছিল! অপরের পর্দানশীন বিবি সে!

ডাকাতগুলি ততক্ষণে ধরে ফেলেছে মান্নুর বউকে। ইস্! পাশবিক ধর্ষণের এমন বীভৎস রূপ কল্পনা করতে পারে না সুবল। ধান-কাটা মাঠের শক্ত খোঁচা খোঁচা ডাঁটিগুলোর উপর ফেলে হিংস্র কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে সব। ভোরের স্পষ্ট আলো ঝাপসা হয়ে আসে সুবলের চোখে। পীতাম্বর সার উল্লসিত মুখটা কুৎসিত অট্টহাস্যে কেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে!

—মার—মার—

মারমুখী মেয়ের দলকে কাছাকাছি এসে যেতে দেখে ডাকাতগুলো পীতাম্বর সা'র পেছন পেছন ছুটে পালায়।

মান্নুর বউয়ের কাছে উদ্বেগে ভেঙে পড়ে সব।—হায় ভগমান—বাঁচবনি?

পুলিশ নিয়ে পীতাম্বর সা'র দল ঘুরে আবার গ্রামের মধ্যে ঢোকে। রাধা! রাধা একলা রয়েছে মনে হতেই সুবল ছোটে গাঁয়ের দিকে।

থেকে থেকে বন্দুকের শব্দে গ্রাম কেঁপে ওঠে। কেঁপে ওঠে সুবলের বুকের ভেতর। প্রাণপণ গতিতে সে ছোটে।

গুড়ুম !···তালা লেগে যায় সুবলের কাণে।

—'সুবল—সু-ব-ল !' কে যেন ডাকছে সুবলকে। পেছন ফিরে দেখে—মনাই। কেন আসছে ? সে কি জানে না পুলিশ এসেছে গাঁয়ে। তছ্নছ্, খুনখারাপি, ধর-পাকড় ভীষণভাবে হচ্ছে গাঁয়ের মধ্যে, জেনে দেখেও সে আসছে কেন ?

আধখানা জিভ প্রায় বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ায় মনাই। মুখের হুই কশে থুথু জমে উঠেছে ফেনার মত।

—'কেমুন মানুষ তুমি—আইয়া পড়লা যে ?' সুবল ধম্‌কে ওঠে—উৎকণ্ঠিত গলায়।

মনাইও অনুরূপ উৎকণ্ঠায় বলে, 'গেরামের অবস্থাটা দেখছনি ?'

—'আরে হের লেইগাই তো তুমি নিমাইহাটা গেছিলা। এইখানে আইলা কোন কামে ?'

উদ্বেগে মনাইয়ের গলা কাঁপে—'পারলাম নারে সুবল সখা, মনডার মধ্যে কেমুন করতেছিল, পারলাম না থাকতে। রাধার পেটে না পোলা ! কতদিনের আশা—মনডা মানল না।'

—'আমি আছিলাম না ;' বলতে বলতে সুবল চলতে আরম্ভ করে।—'তোমারে যদি অহন ধইরা লইয়া যায় ?'

—'হ' সে আশঙ্কাও অস্বীকার করে না মনাই। তবু বলে উৎকণ্ঠিত করুণ গলায়, 'রাধারে বারেক ভাল দেইখ্যা আবার আমি যামুগা।'

এদিক থেকে পুলিশ সরে গেছে। নিরুপদ্রবে মনাই আর সুবল এগিয়ে যায়।

বাড়ীতে ঢুকেই মনাই থমকে দাঁড়িয়ে ডুক্‌রে ওঠে, 'রাধা !'

রাধার মুখে সাড়া নেই। অক্ষত গোলার সামনে উবু হয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত রাধা।

মনাই পাগলের মত ছোঁ মেরে রাধাকে বুকে তুলে নেয়।—'রাধি রে !'

রাধার তলপেটটা যেন কে ছিঁড়ে দিয়েছে। অনর্গল রক্তধারায় ভিজিয়ে দিয়েছে মাটি।

—'হ, রাধার পেটে না পোলা আছিল ? বড় আশা—বহু দিনের··· ।' দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে মনাইয়ের বুকে !

সুবল মনাইকে জড়িয়ে ধরে ।

—'একটা পোলা আছিল । একটা—।' হু হু করে কেঁদে ফেলে মনাই ।

সুবলের বুকে আগুন জ্বলে । রাধার রক্তে ধোয়া মাটির উপর দাঁড়িয়ে কম্পিত ঠোঁটে কি যেন সে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে । বলে আর তার চোখের দৃষ্টিটা ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে । বলে, 'তোমারে ভুলুম না কোনদিনের তরে ।'

পঞ্চায়েত

শনিবার সন্ধ্যাবেলা পঞ্চায়েত বসল মাতাদীনের উঠোনে। ঘোর সন্ধ্যায়। উঠোনের একপাশে সজনে গাছের নরম গায়ে 'তেলচটে'র মশাল জ্বালিয়ে পুঁতে দিল একজন। তার অদূরে বাতাবীনেবুর তলায় পিসিডান অর্থাৎ সভাপতির খাটিয়া পাতা হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে একজন গলায় ঝোলান ঢোলকটা পিটিয়ে দিল ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুম্।

জায়গাটা চটকল শহরের পূবের রেললাইন ঘেঁষা খানিকটা গ্রাম্য নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। লোকগুলো সব চটকলের মজুর হলেও পশ্চিম প্রদেশের ছোটজাতের মানুষগুলোর রীতিই একরকম। এরা সকলেই চামার, কাহার, কৈরী, কামকার অছিরো জাত; পেছনে ফেলে আসা গ্রামকে তারা ভুলতে পারে না। তাই সাংঘাতিক দুর্ঘটনা কিছু না ঘটলে মহল্লা এলাকার অন্যায়ের প্রতিকারটা তারা নিজেরাই বিচার করে পঞ্চায়েত বসিয়ে। এ বিচার অমান্য করলে, কোর্ট কাছারির ফ্যাসাদ না হোক, অমান্যকারীকে কেউ টিঁকতে দিবে না এখানে। জীবন তার দুর্বিসহ করে তুলবে।

ঢোল বেজে উঠল অর্থাৎ সময় হল সভা বসবার। দু'চারটি টিমটিমে লম্ফও জ্বলে উঠল এদিকে ওদিকে। দক্ষিণের তেপান্তরের জোনাকি পোকার মত পিটপিটে আলো জ্বলছে ডোমবস্তীর কুঁড়েগুলোতে। সেখানকার ছাড়া শুয়োরগুলো ছানার পাল নিয়ে খাদ্যান্বেষণে বেরিয়েছে। তেপান্তর পেরিয়ে যখনই শুয়োরগুলো এদিককার বাড়ীর নর্দমাখানার দিকে এগোচ্ছে তখনই এখানকার কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে যাচ্ছে তেড়ে। শুয়োরগুলো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পালিয়ে যাচ্ছে। পূবে রেললাইনটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে যে পাহাড়ের মত পেপারমিলের সাদা নীল রাবিশের বিরাট স্তূপটা, সেখানে

তখনো সন্ধ্যাকালীন সভা বসবার নিশানা পেয়ে কেউ তাড়াতাড়ি কাজ গুছোবার চেষ্টা করতে লাগল।

বুড়ি ভুজাওয়ালী দোকান বন্ধ করে বাদাম আর ভুট্টার খইভাজার ধামা নিয়ে এসে পঞ্চায়েতের আসরে বসল। আজকের শনিবারের সন্ধ্যার বিকিকিনি তার এখানেই হবে। কিন্তু সে এসে যখন দেখল তার আগেই কোত্থেকে একটা ঘুগ্‌নীওয়ালা এসে জমিয়ে বসে আছে তখনই তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। নামহীন উদ্দেশ্যে সে গালাগাল দিতে সুরু করল! খাবার বেচা না ছাই, আসলে বস্তী ঘরের মেয়েমানুষ দেখবার মতলবেই এখানে আসা হয়েছে, তা কি জানি না।

ঘুগ্‌নিওয়ালা মিষ্টি হেসে ছড়া কেটে চলল ঘুগ্‌নির রসালো ফিরিস্তি দিয়ে— যে খাবে ঘুগ্‌নিদানা, সে পাবে সোনাদানা, হায় এমনি ঘুগ্‌নি এনেছি, বহুড়ি লেড়কী মরদ পাবে, বহুড়া মরদ জরু পাবে, হায়—খেয়ে দেখ এমন মশলা দিয়েছি।

কিন্তু সে ছড়ার দিকে কারু কান নেই তখন। সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে খাটিয়ার এক পাশে ওই সজনের গায়ে পোঁতা মশালটার শিখার মতই শুকালুর বিধবা বহুড়ি কুনতির উপর। আগুনের শিখাই বটে। মশালের আলোয় তার সারা দেহ আগুনের মত জ্বলছে। শান্ত চোখের মণি দুটো শূন্যে স্থির নিবদ্ধ। দোলায়িত শিখার আলোকে কপালের টিপটা জ্বল্‌ছে দপ্‌ দপ্‌ করে, ঠোঁট দুটো টেপা, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বাঁকা। উদ্ধত যৌবনের গরিমায় বলিষ্ঠ বুক মশালের আলো-আঁধারিতে যেন এক বিচিত্র উদ্দামতার রূপ নিয়েছে। কোলের ছেলেটা তার বারবারই বুকের কাপড়টা খুলে ফেলে স্তন মুখে পুরে দেওয়ার চেষ্টা করছে। না, অবুঝ স্তন্যপায়ী ছেলেটা মানুষকানা। মায়ের বুক ঢাকার গোপন লজ্জা তো সে জানে না! কুনতির ছ' বছরের আর চার বছরের মেয়েটাও দু' পাশ থেকে ঘিরে বসেছে মাকে। যেন পাহারা দিচ্ছে। বড় মেয়েটা অবাক্ হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ছোট মেয়েটা সভায় ভিড় করা মেয়ে-পুরুষদের মুখগুলো গভীর সন্দেহে নিরীক্ষণ করছে তার ড্যাবা ড্যাবা চোখে। যেন

এদের কাউকে বিশ্বাস নেই তার। প্রয়োজন হলে এরা বোধহয় তার মায়ের ফাঁসীর হুকুমও দিতে পারে। কোলের ছেলেটা বুকের কাপড় টেনে টেনে হতাশ হয়ে হা করে মশালটার দিকে তাকিয়ে রইল রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে।

শুকালুর এ বিধবা বহুড়ি কুনতির বিচারের জন্যই পঞ্চায়েতের আয়োজন।

বস্তীর মেয়েরা যে যার কাজ গুছিয়ে তাড়াতাড়ি নিজেদের একটা জায়গা করে বসেছে। যারা কাজ এখনও মেটাতে পারেনি তারা কেউ স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়েছে, পেটাচ্ছে বাচ্চাদের। এ সভার উপরে যেন তাদের অনেক কিছু নির্ভর করছে। কিন্তু সব পঞ্চায়েতেই মেয়েরা এরকম ভিড় করে না। যে কুনতির নিশ্বাসে তারা বিষ ঝরতে দেখে, তার বিচারসভা যদি ফস্‌কে যায় তবে বুঝি জিন্দিগীর মধ্যে একটা বিরাট ফাঁকই থেকে যাবে।

রতনতাঁতীর রোগা বউটা কিছুতেই বুকের নিশ্বাসটা আটকে রাখতে পারল না কুনতির দিকে তাকিয়ে। ইস্‌! কে বলবে ওই বাচ্চা তিনটের মা ওই মাগী। যেন সেদিনে গাওনা মিটিয়ে জোয়ান লেড়কি শ্বশুর ঘর করতে এসেছে।

মেয়েদের সকলের চোখই প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করছে। তাদের সমবেত চাউনি থেকে ভাবটা ফুটে উঠছে এমন যেন তাদের এক দুর্জয় শত্রুকে এইমাত্র ধরাশায়ী করে তখনো ঘৃণায়, রাগে ক্লান্তিতে ফুঁসছে তারা।

মেয়েদের দলটার সামনেই যে বউটি নাকের পাটা ফুলিয়ে ঠোঁট টিপে স্থির শক্ত দৃষ্টিতে কুনতির দিকে তাকিয়ে বসে আছে সে হল ধনিয়া। এ বস্তীর মালিক মাতাদীনের দ্বিতীয়পক্ষের খাণ্ডার বউ। বলতে গেলে সে-ই এ পঞ্চায়েতটা ঘটাল কুনতিকে সে কোন দিনই সহ্য করতে পারে না। তাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল, খানিকটা সতীনের ঝগড়ার মত। শেষ পর্যন্ত কালকে কুনতির সঙ্গে তার হাতাহাতি মারামারি হয়ে গেছে। কম করে নিজ এলাকার মেয়েপুরুষ নিয়ে দু' তিনশো লোক সে মারামারি দেখেছে। তাকে মারামারি না বলে দুই বেড়ালীর কামড়াকামড়ি খামচাখামচি বললেই ভাল হয়। কুনতির ঠোঁটের আর ভ্রূর উপরে যে ক্ষতের দাগ রয়েছে তা ওই ধনিয়ার কঙ্কনের

ঝাপটাতেই হয়েছে। মহল্লার ঝি বহুড়িরা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে দজ্জাল ধনিয়ার পিটুনি খাইয়েছে কাল কুনতিকে। কেউ ছাড়ানো তো দূরের কথা, বরং সবাই হাততালি দিচ্ছিল আর মরদদের মধ্যে যারা ছাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল তাদের দু'হাতে টেনে ধরে রেখেছিল। মাতাদীন পর্যন্ত মুদীখানা ছেড়ে ছুটে এসেছিল। ধনিয়া তখন কুনতির চুলের মুঠি ধরে মাটীতে লুটোলুটি করছিল, আর কি সরম কি বাত! মাতাদীন এসে দেখল ধনিয়া লড়তে গিয়ে পা দুটো ঠেস মারার জায়গা না পেয়ে এমনভাবে শূন্যে পা ছুঁড়ছে যে পুরুষরা তো দূরের কথা ঝি বহুড়িরা লজ্জায় মুখ ফেরাবার চেষ্টা করছে। সে লজ্জায়, ভয়ে 'হায় রাম' বলতে বলতে যেমনি ধনিয়ার গায়ে হাত দিয়েছে অমনি ধনিয়া তাকেই পা ঘুরিয়ে মেরেছে এক লাথি। আর শাসিয়ে দিয়েছে, "বাড়ীবালা হয়ে তুই বুড়ো রেণ্ডি পুষবি বস্তীতে! তোর বাড়ীবালার মুখে মারি ঝাড়ু।'

মাতাদীনের আর চোদ্দ পুরুষেরও সাহস ছিল না ধনিয়ার গায়ে হাত দেয়। সে তার ঝুলে পড়া গোঁফের ফাঁকে 'হায় রাম' করতে করতে বসে পড়েছিল। যেন তাইতেই দেবী তুষ্ট হয়ে রোখ ছাড়বে।

এ রকম কতক্ষণ চলত বলা যায় না যদি এ সময়টাতে হীরালাল না এসে পড়ত। সে এ বাড়ীর বাসিন্দা ঠিক নয়, তবে এ মহল্লা এলাকায় তাকে সবাই খুব ভালোভাবে চেনে। নানান্ জনে তার নানান্ নাম দিয়েছে। কেউ বলে ফেরেববাজ, কেউ বলে গুণ্ডা, কেউ বা খুব লিখাপড়া জানা 'জোয়ান', কেউ কেউ চোখ বড় বড় করে ফিসফিসয়ে বলে, 'ও ছিয়াশি মানায়।' অর্থাৎ বিপ্লবী মানুষ। সে যে কি তা অবশ্য নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে সে হল চটকলের একজন স্পিনার, একলা বে-ঝামেলার মানুষ! সাদী বেহা'র ধার ঘেঁষেনি সে।

ব্যাপারটা এসে দেখেই তার সমস্ত মুখটা রাগে ঘৃণায় বেদনায় জ্বলে উঠল। পরমুহূর্তেই কঠিন বিদ্রূপে হেসে সে চীৎকার করে উঠল, আরে বাহ্ বা, কেয়া মজাদার খেলা! বেশ বেশ!' কুনতির ছেলেমেয়েরাও ধূলায় পড়ে ডাকছেড়ে কান্না জুড়েছে। সেদিকে দেখে বলল, 'আরো জোরে চিল্লা, এদের কানের পর্দা একটু মোটা কি না।' ধনিয়া তখন কঙ্কনের ঝাপটা মারছে কুনতির ঠোঁটের পাশে।

সেদিকে দেখে বলে উঠল, 'আরো জোরে, আরো জোরে চালাও বাড়ীবালি ভউজি। ঠোঁট যদিও বা ফাটে, থুৎনিটা ভাঙ্গবে না ওতে।'

হীরালালের উলটো গাওয়ার ফল ফলতে দেরী হয়নি। ধনিয়ার হাত আপনা থেকে শিথিলই শুধু হয়ে এল না—জোঁকের মুখে নুন দেওয়ার মত এতক্ষণ যে লজ্জার মাথা একেবারেই খেয়ে বসেছিল তা যেন চকিতে তাকে অবশ করে দিল। সে তাড়াতাড়ি গা আর ঘোমটা ঢাকবার জন্য নিজের কাপড় নিয়ে টানাটানি সুরু করল।

কুনতি এ মারামারিতে প্রতিরোধের চেষ্টাই করেছে। সে-ও প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় নিজেকে ঢাকবার চেষ্টা করছে। ছেলেমেয়েগুলি মা'কে মুক্ত পেয়ে তখন ধরেছে ছেঁকে।

কিন্তু হীরালালের বাক্যবাণ তখনো শেষ হয়নি। সমবেত মেয়েপুরুষদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'একি, রাজা মহারাণীর দল তোমরা থেমে গেলে কেন? ভউজিদের নিয়ে আর একবার মার হাততালি, মাদারিখেল্ সুরু হয়ে যাক্।'

বিদ্রূপটা স্পষ্ট না বুঝলেও সকলেই কেমন বিব্রত কাষ্ঠহাসিতে দাঁতগুলো বের করে রাখল শুধু। হীরালাল মঞ্চের অভিনেতার মত দু' পা এগিয়ে এসে আবার বলল, 'সারাদিন বাদে সাহেব সর্দারের ঠোক্কর খেয়ে কারখানা থেকে ফিরে এসেছ, এখন একটু খেলা না জমলে দিলখুস হবে কেন? কি বল বৈজু ভাই? মুরগীর লড়াই নয়, ষাঁড়ের লড়াই নয়, একেবারে অওরতে অওরতে। আরে বাপ্‌রে।'

চলল সে হাসতে হাসতে কিন্তু তার চোখ দুটো যেন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। জমাটি ভিড়টা তখন তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যেতে বসেছে।

সময় বুঝে মাতাদীন উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ, এতক্ষণে তাকে বাড়ীওয়ালা বলে চেনা যাচ্ছে। গোঁফটা দু'হাতে তুলে, সকলের দিকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ঘোষণা করল, 'কাল এর বিচার হবে, পঞ্চায়েত বসবে। সকলে হাজির থাকবে। এসব আর চলবে না আমার বাড়ীতে।'

'জরুর!' হীরালাল পা ঠুকে বলল, 'এতদিন চলল কি করে সেটাই তাজ্জবের ব্যাপার।' বলে সে এমনভাবে মুখটাকে বিকৃত করে তুলল যে, তাই দেখে মাতাদীন চলে যেতে যেতে অস্ফুট গলায় বলে উঠল, 'লুচ্চা কাঁহিকা।'

ভিড়টা কেটে গেল প্রায়। কুনতি গায়ের ধূলো ঝেড়ে ওইখানে বসেই কোলের ছেলেটাকে স্তন পান করাচ্ছে। কিন্তু ছেলেটা বার বার স্তন থেকে মুখ তুলে মায়ের ঠোঁটের রক্তাক্ত ক্ষতটা নিরীক্ষণ করছে আর শিশুমনের কৌতূহলেই বোধ হয় তার ছোট আঙ্গুলের ডগায় ক্ষত থেকে রক্তের ফোঁটা নিয়ে নিজের ঠোঁটের পাশে ঘষে দিচ্ছে: মেয়ে দুটো গালে চোখের জলের শুক্‌নো দাগ নিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মায়ের দিকে।

রাগে না ক্লান্তিতে বোঝা যায় না, কুনতির বুকটা তখনো ফুলে উঠছে। কাপড় ঢেকে ছেলেটাকে স্তন খাওয়াতে চাইলেও তার সুগঠিত বুক আনমনা অবহেলায় খানিক উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার ঠোঁটের পাশের নিয়ত রহস্যময় বঙ্কিম রেখাটি। তবু চোখে তার এক ফোঁটা জল নেই। এত ধূলো মাখামাখিতেও জ্বল জ্বল করছে পেতলের টিপটা তৃতীয় নয়নের মত তার ভ্রূর মাঝখানে।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে হঠাৎ হীরালাল নীচু গলায় বলল, 'চোটটা বড় জোর লেগেছে। বলিস্ তো ডগদর বাবুর কাছ থেকে থোড়া দাওয়াই নিয়ে আসি?' বলতে বলতে বিদ্রূপভাষী হীরালালের মুখটা একেবারে অন্যরকম হয়ে উঠল।

কিন্তু কোন জবাব দিল না কুনতি। শুধু মেয়ে দুটা অবাক হয়ে হীরাচাচার দিকে তাকিয়ে রইল সংশয় নিয়ে। জন্মের পর থেকে ওরা দেখেছে, যারা মায়ের সঙ্গে কথা বলে তারা সকলেই মতলববাজ।

পরমুহূর্তেই হীরালাল গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বেশ, তুই-ই বল্ না কেন, তোর মত কোন বিধবা বহুড়ি কেবলি যদি পেটে বাচ্চা ধরে কার না গোসা হয়? মহল্লার মেহেরারুরা তোকে কোন্‌দিন পিটিয়েই মেরে ফেলবে।'

কুনতি এবার ফুঁসে উঠল, 'আপনা পেটে ধরি, কার বাবার কি?'

'বাঃ বেশ বলেছিস্। কার বাচ্চা ধরিস ?' হীরালাল হাসতে চেষ্টা করে।

কুনতি ছেলে নিয়ে উঠে বলল, 'যারই ধরি তোমার তো নয়।'

'আফশোস!' এবার হেসে ফেলল হীরালাল।

হঠাৎ আগুনের মত জ্বলে উঠে কুনতি বলল, 'আফশোস নয়, তোমার মতলব আমি খুব জানি। ভুলিয়ে ভালিয়ে ফোকাটিয়া কাম চাও তুমি। সে ওই বুড়ো ভাতারি ধনিয়ার কাছেই হবে।' বলতে বলতে রুদ্ধ কান্নায় থম্‌থমিয়ে উঠল তার মুখ।

হীরালাল দরাজ গলায় হেসে উঠল এবার।

কুনতি আপন মনে বলে উঠল, 'পঞ্চায়েত হবে, বিচার হবে আমার! খানা বিনা যখন মরছিলাম কটা পঞ্চায়েত বসেছিল তখন ? বেহায়া দুনিয়ার ফুটানীর মুখে মার ঝাড়ু।'

যেন ঝাড়ু দিতে দিতেই ঘরে চলে সে। কেবল হীরালালের উদ্গত হাসিটা বুকেতেই আটকা পড়ে গেল। আপন মনে বিকৃতমুখে বিড় বিড় করতে লাগল সে, 'বেহায়া দুনিয়ার ফুটানি......'

দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে যার বুকে জ্বালা ধরে গেল, সে হল ধনিয়া। নিজের জ্বালায় সামনে উনুনের উপর কড়াতে যে ভাজি পুড়ে ছাই হয়ে গেল তা সে খেয়াল করল না। কেবলি মনে হতে লাগল, হীরালালের মত মানুষ ওই রেণ্ডিটার সঙ্গে কি কথা বলছে এতক্ষণ ?

এতক্ষণে হঠাৎ কুনতি পঞ্চায়েতের আসরে চোখ তুলে ধরল। সত্যিই সেই দিলখোলা হাঁকডাক করা মানুষ হীরালালটা কোথায় ? কুনতির বিচারে কি সে গরহাজির থাকবে ?

সে মুখ তুলতেই নতুন বিয়ে করা বিট্‌লে হাসকুটে ছোঁড়া পুনিয়া দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'এই যে বড় ভউজি আমি এখানে। কি বলবে বল ?' যেন কুনতি তাকেই খুঁজছে।

কুনতি অপ্রতিভ ভাবেই মুখটা ফিরিয়ে নিল তার দিক থেকে। পুনিয়া

অমনি দু'হাত তুলে হতাশার ভঙ্গি করে বলল, 'হায় রাম! আমাকে নয়?' একটা হাসির রোল পড়ে গেল চারদিকে।

রাগে বিস্ময়ে অবাক মানল ঝি বহুড়িরা, পুনিয়ার ঠাট্টায় কুনতির ঠোঁটে হাসির ঝিলিক দেখে। পুনিয়ার নতুন বউ পাকা পাকা মেয়েটা রূপোর নতুন নথ্‌টা নাড়িয়ে বলল, 'ওমা, মাগী কি বে-সরম!' বলে সে চোখ পাকিয়ে তাকাল পুনিয়ার দিকে। পুনিয়া এক চোখ বুজে তার জবাব দিল।

মিসিমাখা মাড়ি বের করে বলল বুড়ি ছেদি, 'রেণ্ডির আবার সরম। জোয়ানী উমরে আমাদেরও গোলমাল হয়েছিল। পঞ্চায়েত হয়েছিল, সাজা দিয়েছিল। তা আমরা কি ওই হারামজাদীর মত বসেছিলাম? বুক অবধি ঘোমটা ছিল—হাঁ।' না জানি কি কথাই বলল এমন বুড়ির ভাবখানা।

রতনের রোগা বউটা বলে উঠল, 'মহল্লার মরদদের রক্ত খাওয়া চেহারা যে। খুলে দেখাবে না?'

এমন সময় পুরুষদের মধ্য থেকে একজন দু'হাত কানে লাগিয়ে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গেয়ে উঠল,

এ যমুনাকে যানে বহলি, কহি তেরি গোর লাগি
উদাস তুহার নয়ন হম্‌সে মিলাকে যা।

চারদিক থেকে একটা উল্লাসধ্বনি উঠল, হায় হায় হায়।...

আর একজন সরু গলায় সুর করে রাধার উক্তি করে উঠল,

চোট্টা কানাইয়া কালা বিল্লি বন্‌কে আওত...

হাসি আর খেউড়ের ঝড়ে সমস্ত পঞ্চায়েতের সভাটা উন্মত্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে এত গান হল্লা, সেই কুনতি নির্বিকার। মেঘের কোণে বিদ্যুৎ চমকানির মত শুধু তার ঠোঁটের কোণের বঙ্কিম রেখাটি ও কপালের উজ্জ্বল টিপটি ঝিলিক দিয়ে উঠছে। কিন্তু তা যেন ঘুমন্ত অজানায় আচম্বিতে। ভিড়ের মাঝে চোখজোড়া তার খুঁজছে হীরালালকে।

মাতাদীন চীৎকার করে উঠল, 'চুপ, চুপ সব বেতমিজ কোথাকার। পঞ্চায়েতের কারবার এখুনি সুরু হবে। ঠাকুরজী আসছে।'

ঠাকুরজী অর্থাৎ হড়কু ঠাকুরজী আসছে। নিজেদের গাঁ ঘরে পঞ্চায়েত হলে সরপঞ্চ্ অথবা রউয়া হুজুর মালিকেরাই সভার প্রধান হয়। না হলে নিজের জাতের মুখিয়ারা সভাপতিত্ব করে। এখানে এই বিদেশে চটকল শহরে সে সুযোগ নেই, তার উপায়ও নেই। কালোবাজারে যারা ধনে মানে বড় বা কারখানার হেডসর্দার, তেজারতী মহাজনী কারবারী, তাদেরই এরা 'পিসিডান' অর্থাৎ সভাপতি করে কাজ চালায়।

ঠাকুরজী একজন মস্ত ধার্মিক তো বটেই, সুদী কারবারী বলেও বিখ্যাত। এখানকার ফকির কুলি-কামিনকে অভাবে ধারকর্জ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। সুদটা একটু বেশী। কিন্তু সে তো সে নেয় পরমেশ্বর রামজীর সেবার জন্য। আর ডোম বস্তীর দক্ষিণে অন্ধগলিতে যে সুদীর্ঘ বেশ্যাবস্তীটা গড়ে উঠেছে তার কর্তাও সে। বলে, ঘরের ময়লা সাফ করে ফেলবার জন্য একটা আঁস্তাকুড় চাই তো। সে তোমার দেওতার রাজত্ব স্বর্গেও খানিক আঁস্তাকুড় আছে। দুনিয়ার নিয়ম এটা।

ইতিমধ্যে মাতাদীনের উঠোনটা একেবারে ভরে গেছে। ভিন্ মহল্লার যারা শুনেছে ঘটনাটা, তারাও এসেছে। কেননা কুনতি কম বেশী সব মহল্লাতেই পরিচিতা। পঞ্চপাণ্ডবের মা শাশ্বত কুনতি সূর্যদেবতার অনুরাগে পুড়ে লুকিয়ে সেই অগ্নিগর্ভে নিজের যৌবন সমর্পণ করেছিল। লাভ করেছিল অবৈধ সন্তান। সবাই বলে এটা নাকি কলিযুগ। হীরালাল বলে, নোকরশাহীর যুগ। এ যুগের কুনতি নিজেই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত মহল্লায় জোয়ানমরদদের দিল পুড়িয়ে বেড়ায়। মহল্লাগুলো মাতাল হয়ে ওঠে, সেই আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য। তাই তার বিচারে এত ভিড়। কেউ রীতিমত শুঁড়ি-তাড়িখানার আড্ডা ছেড়ে এসেছে চলে। তবে এই জমাটি সভায় পানীয়ের ভাঁড়টি নিয়ে এসেছে কেউ কেউ। তা ছাড়া গতকাল গেছে শুক্রবার, হপ্তার দিন, শনিবারের রাত্রে আকণ্ঠ পিপাসা না মেটালে সমস্ত সপ্তাহটাই যে ব্যর্থ।

লম্ফ আরও দু' একটি এসেছে। ঘুগ্নিওয়ালার হাঁড়ি প্রায় শেষ। ভুজাওয়ালী একটানা বক্‌বক্ করে গালাগাল দিয়েই চলেছে। কেননা এখনও

তার কাছ ঘেঁষেনি কেউ। আর এই ঘুগনি খানেওয়ালারাই না ঘরে চাল আটা গিলে শেষ করে ধারে তার ভুট্টা আর ছাতু খেয়ে পড়ে থাকে! বেইমানের দল!

এক পাশে আর একটি পঞ্চায়েত বসেছে। তবে সেটা হল ছোট ছোট বালবাচ্চাদের। অনুকরণেরও কায়দা আছে। বড়দের সভায় এখনও সভাপতি আসেনি যখন, তখন তাদের সভায়ও ইঁটপাতা আসনটি খালি রয়েছে। সবচেয়ে দেখতে ভাল ভিখারির মেয়েকে তারা বানিয়েছে কুনতি, আবার তার থেকেও বড় ছুটো মেয়েকে বানানো হয়েছে তার মেয়ে। মাতাদীনের আগের পক্ষের ধুমসো পাঁচ বছরের ছেলেটাকে সাজানো কুনতির ছোট্ট কোলটিতে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার ছেলে বলে। বেচারীর জান যায় আর কি? কিন্তু অমান্য করবার উপায় নেই।···বড়দের মত এরাও গান আর খিস্তি জুড়েছে। কেবল বৈজুর ছেলেটা সাজানো কুনতির কানের কাছে সবাইকে লুকিয়ে বার বার বলে যাচ্ছে, এ খেলাটা মিটে গেলে তোর সঙ্গে আমার সাদী হবে, অ্যাঁ?

কিন্তু সাজানো কুনতি নির্বাক! কারণ আসল কুনতিও নির্বাক যে!

হঠাৎ ভিড়ের মাঝখান থেকে হীরালাল চেঁচিয়ে উঠল, 'মার হাততালি, খেল্ এখনি স্থরু হবে। ওস্তাদ আসছে।'

একদল সত্যি সত্যি হাততালি মেরে উঠল। ওস্তাদ অর্থাৎ হড়কু ঠাকুরজী আসছে। মাতাদীন গোঁফের পাশ দিয়ে হিসিয়ে উঠল, 'লুচ্চা কাঁহিকা।'

হীরালাল চকিতে একবার কুনতিকে দেখে নিল। কুনতিও তার দিকেই তাকিয়েছিল। সে অবাক্ মানল লোকটার এতক্ষণ ভিড়ের মাঝে চুপ করে বসে থাকা দেখে। কেন? এত দিল্লেগী, এত ফালতু বাত যে করে, কুনতির বিচারে বুঝি তার কোন আগ্রহ নেই! তার আদমি শান্তশিষ্ট শুকালু ছিল জোয়ান হীরার মস্ত ভক্ত। প্রথম যেদিন স্থদূর গ্রাম ছেড়ে ঘর ছেড়ে শুকালু এই চটকল সহরে এল সেদিন থেকেই যেন সে ভেঙ্গে পড়েছিল। সেই ভেঙ্গে পড়ার দিনে হীরা ছিল তার একমাত্র অন্তরঙ্গ। নানা দেশ বিদেশের গল্প করত আর মাঝে মাঝে আগুনের মত জ্বলে উঠত নিজেদের জীবনের কথা বলতে

গিয়ে, 'আরে গোলামের জান আছে, আমাদের চটকলিয়াদের শালা তাও নেই। আমরা মেসিন, দোস্‌রা আদমির মর্জি আমাদের চালায়।' কখনো কখনো শুকালুর শান্তিপনাকে সে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করত, 'হাঁ, আশমানের দেওতার দিকে তাকিয়ে থাক, সে একদিন আবার তোমাকে নিরালা গাঁয়ের ভিটায় তুলে দিয়ে আসবে।' কিন্তু পরমুহূর্তেই শুকালুর হাতটা চেপে ধরে বলত, 'দোস্ত, তুমি এরকম থেকোনা, মরে যাবে। এ যে চটকলের বাজার! কিছু না পার, দমভর্ দারু পিও, মাতলামী কর, জরুকে পাক্‌ড়ে পেটাও, নইলে যত শোচ্‌বুঝ করবে, তত দেখবে, চটকল তোমাকে গিলতে আসছে। আর নইলে···নইলে ফিকির কর এ দুনিয়া পাল্‌টে ফেলবার।' কিন্তু গিলেই ফেলল চটকল শুকালুকে। দু'সাল গেল না, ভঁইষের লেজ মোচড়ানো লাঙ্গলধরা হাতে যেদিন এসে মেশিনে হাত দিল সেদিন থেকেই মৃত্যু তার হৃৎপিণ্ডে জেঁকে বসল। ওহো, কি মড়ক যে এসেছিল দেশে! মানুষ মরল, ভঁইষ মরল, জমিন্ শক্ত হাঁ করে পড়ে রইল বাপহারা বেটীর মত। মহাজনের রাক্ষুসে হাত দরজায় দরজায় থাবা বাড়াল।··· শস্যহীন ঝরাপাতায় ছাওয়া উঠানের উপর দিয়ে কুনতিকে নিয়ে চলে এল সে! মোষবাঁধার শূন্য খোঁটাটা নীরব ব্যথায় স্তব্ধ হয়ে যেন তাদের বিদায় দিয়েছিল। কিন্তু মানুষটা বাঁচল না।······

নিশ্বাসে দুলে উঠল কুনতির বুক। সামনে থেকেই কে যেন জিভ দিয়ে তু তু শব্দ করে উঠল সান্ত্বনা দিয়ে। রতন তাঁতীর বউ হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, 'এখন কত পানি পড়বে চোখের। রাক্ষসের মত পেটবাগানোর সময় মনে ছিল না?' খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল ধনিয়া। বুড়ি ছেদি মাড়ি বের করে বলল, 'চোখের পানিতে না সভাটাই ডুবে যায়।'

ও! কুনতির চোখে বুঝি জল এসেছে! তাই সান্ত্বনার তু তু শব্দ, বহুড়িদের এত কথা! তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে জল মুছল সে। ঘুমন্ত কোলের ছেলেটাকে মাটিতে শুইয়ে দিল।

বৈজুদের দলটা ততক্ষণে তাড়ির নেশায় চুর চুর। মত্ত বৈজু চেঁচিয়ে উঠল, 'বোলাও শালা লেবার বাবুকে, হাজির কর হাজিরা বাবুকে, বলুক সামনে এসে

আমার কাছ থেকে দুশো টাকা ঘুষ খেয়েছে কি না।' মাতাদীন খিঁচিয়ে উঠল, 'নিকাল দেও গিদ্ধর মাতালটাকে।'

তাড়িমত্ত আর একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঁ নিকাল্ দেও মাতালটাকে।'

হাসি আর সোরগোল পড়ে গেল একটা।

কিন্তু হীরালাল 'বৈজু'র নাম ধরে একটা হাঁক দিতেই মাতালের দলটা সামলে উঠল খানিকটা। তারপর আর সবাইকে হাত জোড় করে বিনয়ে হেসে বলল সে, 'মেহেরবাণী করে একটু শুনুন হুজুর হুজুরাইনরা, দিল কি বাত্ একটু বাদেই করবেন।'

কুনতি তাকিয়েছিল হীরালালের দিকে। হ্যাঁ, এমনি দিলজ্বালানো দিল্লীগি করা স্বভাব লোকটার। হপ্তা আর ছুটির দিনে যখন ছোকরা মরদেরা সাফা জামা গায় দিয়ে মাথায় তেল চুব্‌চুব্ করে বেরোয়, তখন হীরা তাকে সেলাম করে যেমন কারখানার সাহেবসর্দারকে করে আর বেশ্যাগলির পথটা দেখিয়ে বলে, 'হুজুর, গরমী বিমারের দাওয়াইয়ের দামটা ফেরবার সময় হড়কু ঠাকুরজীর কাছ থেকে উধার নিয়ে এস।' মেয়েরাও সেজেগুজে এদিক ওদিক দেখে চট করে বস্তী থেকে বেরিয়ে পড়ে। কেউ যায় জংলা ঘুমে। কারখানার বাঁধাধরার মধ্যে থেকেও জীবনের কোন বাঁধাধরা নিয়ম যেন নেই এখানে। প্রতি মুহূর্তের নিরাশায় উচ্ছৃঙ্খল মহল্লাগুলোর কোন কোন জোয়ানী সব ভুলে অভিসারে বেরিয়ে পড়ে। হীরা তাদের বলে, 'শু'নো হো, একটা গয়লার গলায়ও মহব্বতের দড়ি পরিও, নইলে তোমার আ'নেবালা বাচ্চা দুধ বেগর পটল তুলবে।'

তার কথায় কেউ হাসে, কেউ রাগে। কিন্তু সকলেরই মনটা শুধু দমে যায় না, কেমন যেন বিব্রত, অস্বস্তিতে বুকটা ভরে ওঠে। কিন্তু হাঁ, বড় তাজ্জবে অবাক্ হয় কুনতি। লোকটা নিজে কোন আওরতের কাছে ধরা দেয় না। না, কুনতির কাছেও না, যার দিকে মহল্লার সব মরদেরা হাপিত্যেশ করে তাকিয়ে থাকে। অথচ কুনতি একসময়ে ভাবত…

আবার শুকালুর কথা মনে পড়ে গেল তার। লোকটা মরে গেল। কিন্তু এখানকার ভাষায় সে বিধবা হল না, হল বেওয়ারিশ আওরৎ। চটকলের পাটঘরে

তার একটা সল্‌তানি বদলী নোকরি মিলল। সল্‌তানি অর্থে পার্মানেণ্ট। বদলী মানে অন্য মেয়ে মজুর যখন ছুটীতে যায়, রোগে পড়ে, তখন সে পুরো মাইনে পায়। না হলে কোম্পানী থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে দুটাকা মাইনে দেবে।······জোয়ান উমরের আওরৎ, সন্তানহীনা, চলতে ফিরতে বলিষ্ঠ শরীরে তার যৌবন যেন উছলে পড়ত। শোকাচ্ছন্ন হীরা দূর থেকে তাকিয়ে থাকত। কি যেন সে বলতে চায়, কি যেন বোঝাতে চায় তার চোখের চাউনি। কিন্তু দ্বিধা সংকোচে এগুত না। কুনতি ভাবত, কি বলবে বলনা জোয়ান, অমন করে চেয়ে কেন থাক! হীরার ভাব দেখে সেই মুলুকের গাঁয়ের লু বয়ে যেন বুক পুড়ে যেত তার। এ সময়েই একজন তাকে বিয়ের নাম করে ঘরে নিয়ে তুলল। কিন্তু মতলব ছিল লোকটার। একদিন গভীর রাতে পাটকলের সর্দারকে ঘরে এনে ওর আলিঙ্গনে তুলে দিল কুনতিকে। বাইরের থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, সল্‌তানি বদলী নোকরিটা পেলি, তার নজরানা দিতে লাগবে না?······

সেই হল তার নতুন জীবনের সুরু। ধীরে ধীরে হীরার শোকের ছায়াটা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক বিদ্রূপ হাসি ফুটে উঠল। বলত, 'জিতা রহো চটকলবাজার।' কুনতিকে আর সে ভউঝি বলত না। নাম ধরে মাঝে মাঝে বলত, 'তোর মতলব ভাল নয়। নইলে এত মরদ থাকতে কারুর সঙ্গে তো তোর মহব্বত হয় না!'

মহব্বতের কথা শুনলে কুনতির ঠোঁটের বঙ্কিম রেখাটি আরও বেঁকে ওঠে কঠিন বিদ্রূপে। মহব্বত!···পরপর কয়েক ঘর ঘুরেছে সে শুধু বিয়ের আশায়। কিন্তু বিয়ে কেউই করে নি! উপরন্তু পেটে এসেছে বাচ্চা, ঘর করার নামে মিলেছে শুধু মাতালের মার। তারপর নিজের ভার নিজেই নিয়েছে সে।

না, তবু কুনতি হীরালালের ধাতটা ঠিক বুঝতে পারে না। রোজই একবার কুনতির খবর জিজ্ঞেস করে সে আর বলে, 'এ পথ ছেড়ে দাও।'

কোন পথ ধরবে কুনতি? অনাহার আর মৃত্যু? জিজ্ঞেস করলে খানিক-ক্ষণ থম্ ধরে থেকে বলে, 'নাঃ তোমার ভাল মতলব নেই।' কিন্তু তার মতলবও কুনতি আবার বুঝতে পারে না। তবে কি···

হ্যাঁ, সেই ভেবে কোন কোন দিন বিলোল কটাক্ষে মোহিনী ভঙ্গিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে হীরাকে। ভ্রূর মাঝে টিপ কাঁপিয়ে হেসেছে। কিন্তু হীরা বিকৃত মুখে দূরে সরে গেছে। রাগলে তাই কুনতি বলে, 'ফোকাটিয়া কাম চাও তুমি।'

সভার মধ্যে হঠাৎ মাতাল মহাদেও চেঁচিয়ে উঠল বুক চাপড়ে, 'কসম খেয়ে বল্‌ছি ওর আদমি শুকালু আমার কাছ থেকে বারো আনা উধার নিয়েছিল।' মাতাল বৈজু তাকে দু' হাতে ধরে বলল, 'ওরে শালা, আদমি মরে গেলে উধার শেষ হয়ে যায়।'

মহাদেও তবু চেঁচাতে লাগল, 'আমি বল্‌ছি উধার নিয়েছে।'

হীরালাল উঠে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'তবে কি হবে হুজুর? কুনতিকে আপনার চাই?' মহাদেওয়ের ঘোলাটে চোখ ঘোলাটে হয়ে উঠল আরও। সে চুপ করে গেল।

মাতাদীন চেঁচিয়ে উঠল, 'নিকাল দেও মাতালগুলোকে।'

বৈজুও মাতাল গলায় হেঁকে উঠল, 'হাঁ, নিকাল দেও শালাদের।'

ঘুগ্‌নিওয়ালা তার শেষ কণাটিও মাতালদের কাছে বিক্রী করে এবার পঞ্চায়েতের বয়ান শুনবার জন্য এগিয়ে এসে বসল। ভুজাওয়ালী আপনমনে শুধু বকে চলেছে, কাল থেকে কাউকে আর আমি উধার দেব না। ইমান থাকে তো ধার খানেওয়ালারা এখনি পয়সা মিটিয়ে যাও।

ধার খানেওয়ালারা বোধ হয় ইমানদার কেউই নয়। কারণ, কেউই তার কথার জবাব দিল না।

কেবল হীরা বলল ঠোঁট কুঁচকে, 'নানী, সব বেটা বেইমান।'

মাতাদিন হাঁকল, 'চুপ চুপ।'

সভাপতি হড়কু ঠাকুরজী বলল, 'সবই রামজীর খুসীতে চলছে। এই যে আওরৎটিকে তোমরা এত গালি বকছ, ওর এই দুর্ভাগ্য ত রামজীর কৃপা!'

বুড়ো নাথ্‌নি ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'ঠিক, ঠিক।'

কিন্তু তার থেকেও কয়েক কাঠি বুড়ো মতিলাল বলে উঠল নাথ্‌নিকে, 'তোমার মাথা। ওই ছেদিকে যখন তুমি···'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মেয়েদের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গেল। কারণ রামু হামাগুড়ি দিয়ে পেছন হটতে হটতে একেবারে হরিশের বহুড়ি শ্যামদেইর গায়ের উপর গিয়ে পড়েছে। কি ব্যাপার? কেউ লক্ষ্য করেনি, পঞ্চায়েত সভায় কখন রামুর পাওনাদার কাবুলীটা এসে দাঁড়িয়েছে। গতকাল হপ্তা পেয়ে সে কোনরকমে কাবুলীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিল। আজ আর কেউ না দেখুক, রামুর নজরটা ওদিকে কড়াই ছিল। কিন্তু লুকোতে গিয়ে যে মাঠের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে তা সে ভাবেনি।

ব্যাপার বুঝে কাবুলীটা একবার লজ্জিত সন্ত্রস্ত রামুর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল। 'কাল সবেরে শালা তুম্‌কো পাক্‌ড়ায়েগা।'

কিন্তু রেহাই দিল না শ্যামদেই। সে গলা চড়িয়ে গালাগাল দিতে সুরু করল। ফলে রামুর বউ পাতিয়াও কোমর বেঁধে এল।

বুড়ি ছেদি মাড়ি বিকশিত করে বলল, 'হায় রাম। আমি ভাবি বুঝি আন্ধারে মহব্বতের কারবারই চল্‌ছে। তবে বলি শোন ওই বুড়ো নাথ্‌নির কথা। একবার...'

পাতিয়া তখন শ্যামদেইকে ছেড়ে রামুকে ধরেছে। কুনতিকে দেখিয়ে বলল, 'আরে যা রে কমিনা আদমি রেণ্ডি তোর বসে আছে।'

তারপর সে কাঁদতে সুরু করল, 'ওই মাগী জরুর আমাদের হপ্তার টাকায় ভাগ বসায়, জরুর।'

বহুড়িদের কয়েকজনও ওই কথা বলে চেঁচিয়ে উঠল।

মাতাদীন হামলে উঠল, 'চুপ, চুপ কর সব।'

মাতাল বৈজুও হেঁকে উঠল, 'চুপ, চুপ কর সব।'

হড়কু ঠাকুরজী আবার সুরু করল কুনতিকে দেখিয়ে, 'বেচারীর তগ্‌দীর। তবে ওর মত আওরতের এ বস্তীতে থাকা চলে না, কি বল?'

মেয়েরা বলে উঠল, 'জরুর।'

কিন্তু ধনিয়ার চোখ জোড়া জ্বলে উঠল, ফুলে ফুলে উঠল বুক আর নাকের

পাটা। তার জ্বালানো রোষের রোশ্‌নাই ঝিলিক দিয়ে উঠল নাকের নাক-ছাবিতে। সে বলে উঠল, 'ওই মাগীকে কবুল খেতে হবে, ওর বাচ্চাগুলোর বাপ কে।'

মেয়েরা কলরব করে উঠল ধনিয়ার কথার প্রতিধ্বনি করে।

প্রশ্নটা শুনে থম্‌কে গেল সভাটা। এমন কি হড়কু ঠাকুরজীও। মাতাদীনের গোঁফ জোড়া যেন বসে গেল।

ইতিমধ্যে লম্ফ দু' একটা নিভে গেছে। মশালের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল কুনতির কপালের টিপ। উদ্ধত বুক টান করে বসল সে, বুঝি দুলে উঠল নাগিনীর মত। কেঁপে কেঁপে উঠল ঠোঁটের রহস্যরেখা। অঙ্গারের মত প্রজ্বলিত চোখ তুলে তাকালো সে সমবেত পুরুষদের দিকে।

তার মেয়ে দুটো অবাক আকুল অপলক চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের আবার বাপ, তাদের আবার বাপ আছে নাকি?

পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ অন্ধকার ঘেঁসে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ সন্ত্রস্ত ভীত জানোয়ারের মত মাথা নীচু করে রইল বসে। স্তব্ধ, নিঃসাড় সভা।

ঝি বহুড়িদের অপলক চোখগুলো প্রতিহিংসায় জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

হীরালাল চীৎকার করে উঠল, 'বাতলে দাও, দেখি কে বাপের ব্যাটা আছো, বাতলাও মরদেরা।'

সারা মুখে কুনতির নির্মম হাসি। চোখ দুটো যেন ছুরির ফলার মত চক্ চক্ করছে। পুরুষদের মুখের উপর দিয়ে চোখ তার যেন অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ আলোর মত এগিয়ে চলল। কে? কে তার এ বাচ্চাদের বাপ? এই পুরুষদের মধ্যে কোন জন? কে, কে?

খুঁজতে খুঁজতে কুনতির চোখ পড়ল হীরার উপর। অবাক মানল সে হীরার মুখ দেখে, খুসীও হল। এত আগ্রহ হীরার এ জবাব শোনবার জন্য?

কিন্তু হায়, কুনতি কেমন করে বলবে এর মধ্যে কারা বা কে তার সন্তানের বাপ! একলা কার মুখে চুন কালি মাখাবে সে, কার ঘর ভাঙ্গবে?

প্রতিহিংসায় প্রজ্বলিত বহুড়িদের দিকে তাকাল সে। দেখল অন্ধকারে গা

ঢাকা দিয়ে পালানো মানুষগুলোকে। বেলাশেষের শান্ত ঝিলের মত ছায়া নেমে এল কুনতির চোখে। তার সন্তানের আছে শুধু মা, বাপ নেই। মা বাপ দুই-ই ওদের কুনতি। আকুল আগ্রহ ভরা নিজের মেয়ে দুটোর চোখের দিকে তাকিয়ে যেন আচমকা বুক থেকে একটা তুফান উঠে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল তার। নিজের সন্তানদের উদ্দেশ্যেই যেন সে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি জানি না।'

মেয়েরা আক্রোশে ফেটে পড়ল। বুড়ি ছেদি বলল, 'আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, ও মাগী পঞ্চায়েতের রায় কিছুতেই মানবে না। নইলে সাফ জানিয়ে দিলে ও কবুল খাবে না?'

মাতাদীন আর ঠাকুরজী কি বলতে চাইল। গোলমালে ডুবে গেল তাদের কণ্ঠস্বর। পুরুষদের মধ্যে থেকে একটা হাঁফ ছাড়ার নিশ্বাসের সঙ্গে নানা রকম গুনগুনানি সুরু হয়ে গেল।

হঠাৎ পুনিয়া গালে হাত দিয়ে চীৎকার করে গেয়ে উঠল ঃ

এনানী বঢ়ায়ি হম্ কেয়সে কহুঁ তুঝে
হম্ আইহনকে ঘরওয়ালীকো দিল চৌপাট্ কৈলান কৌন্ সে॥

পাতিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'হে ভগবান, হারামজাদির জান চৌপাট কর।'

বুড়ো মতিলালের গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'আজকালকার মরদরা সব ডরপুক, বে-দিল নীচ্।'

ছেট বালবাচ্চাদের পঞ্চায়েত এতক্ষণ সুন্দর অনুকরণে বেশ ভালই চলছিল। কিন্তু সাজানো কুনতির কান্নায় ওদের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গেল। মাতাদীনের ধুমসো ছেলেটা ওর ছোট্ট কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ আগেই সে উঠব উঠব করছিল। কিন্তু আর সহ্য করতে না পেরে বেচারী কাপড়েই পেচ্ছাব করে দিয়েছে। করে ফেলে তারপর কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

বৈজুরছেলেটা মাথামুণ্ডু কিছু না বুঝে ওই অবস্থাতেই সাজানো কুনতির কাপড় ধরেচেঁচিয়ে উঠল, 'আমি কিন্তু ওকে সাদী করব, হাঁ।'

ভুজাওয়ালীর কাছে তখন কেউ কেউ ভিড় করতে আরম্ভ করেছে। আর

ভুজাওয়ালী সবাইকেই বলছে, 'কেন ঘুগ্‌নি খাওগে যাও।' কিন্তু কাউকেই ফিরিয়ে দিচ্ছে না। বুড়ি ছেদী 'তবে বলি শোন' বলে কেবলি চেষ্টা করছে তার যৌবনের গল্প জমাবার। মাতালদের দলটার মধ্যে একজন কুনতির নাম করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আর এক মাতালও তার কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল। অন্য একটা দল পঞ্চায়েতের কোন কথাতেই না থেকে কারখানার সাহেব সর্দারদের আলোচনায় উঠেছে জমে। মেয়েদের নানান্ দফে নানান্ আলোচনা। ঘর, কারখানা, পয়সা, ব্যায়রাম, পুরুষ, ভালবাসা—কোন কথাই বাদ নেই।

হীরালাল একবার এখানে বসছে, একবার ওখানে বসছে, কথা শুনছে সকলের।

প্রায় সব ক'টা লম্ফই নিভে এসেছে। দু'একটা মাত্র জ্বল্‌ছে আর মশালটাও খানিক কমজোর হয়ে গেছে। সেই ক্রমাগত অন্ধকার যেন চেপে বসছে ধনিয়ার সারা মুখে।

ডোম বস্তীর ধাড়ি শুয়ারের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় শেয়ালের আক্রমণের সম্ভাবনায় ছানাপোনাদের প্রতি সাবধানী সঙ্কেত। কুকুরগুলো ঘোরাফেরা করছে পঞ্চায়েতের আশেপাশেই।

বহুদূর থেকে কার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে—হো-উই!

ঠাকুরজী বলল, 'তোমরা সব শুনেছ। কিন্তু আমার বড় দুঃখ হয় কুনতি বেটির জন্য।'

হীরালাল মাতালদের দেখিয়ে ঠাকুরজীকে বলল, 'হুজুর, ওই দুঃখেই এরাও কেঁদে মরছে।'

এ নাস্তিকটার বাক্যবাণ সহ্য হয় না ঠাকুরজীর। মাতাদীন খাপ্পি বলল, 'লুচ্চা কাঁহিকা।'

কুনতির মুখে দেখা দিয়েছে আবার সেই বিচিত্র হাসি। পঞ্চায়েতের আসল বয়ানে তার কান আছে কিনা বোঝা যায় না। সে যেন রামলীলার মজা দেখতে এসেছে।

ঠাকুরজী বলল আবার, 'রামজীর কি লীলা। নইলে বল, কুনতি বেটিরই কেন এ দুর্দশা হবে, আদমি মরে যাবে? তোমার আমার কোন হাত নেই এতে। যা হবার তা হবেই। আমরা খালি অশান্তিটা দূর করে দেব। এ বস্তী ছেড়ে ওকে চলে যেতে হবে।' বলে তাকাল কুনতির দিকে যেন তার মমতা, করুণা এ স্বৈরিণী মেয়েটার জন্য।

হীরালাল চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে হুজুর?'

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'জাহান্নামে।'

আর একজন বলে উঠল, 'বোধ হয় ডোমবস্তীর দক্ষিণে ঠাকুরজীর জেনানা পট্টিতে।'—একটা হাসির রোল পড়ে গেল। অর্থাৎ ঠাকুরজীর বেশ্যাপট্টিতে। গম্ভীর হয়ে উঠল ঠাকুরজীর মুখ। বলল, 'কাল ধনিয়া বেটির সঙ্গে মারপিট করেছে ও, আর বিধবা হয়ে তিনটে বাচ্চা পয়দা করেছে, ও জাত থেকে আলাক্ হয়ে গেছে।'

ঠাকুরজী ব্রাহ্মণ মানুষ। এরা তার দেশের সব চামার কাহারের জাত। দেশের গাঁয়ের পঞ্চায়েতে সে বহুবার সভাপতিত্ব করেছে। এখানেও করেছে। কিন্তু এখানে এ কালবাজারে সেই মানুষগুলোর চরিত্রই শুধু বদলায় না। এখানে সমাজ ব্যবস্থা না থেকেও এক বিচিত্র বস্তী সমাজ আছে। সামাজিক বিচারের যে শাস্তি তার কোন মূল্যই প্রায় নেই এখানে। এখানকার শাস্তি জরিমানা করেই বেশী হয়। মনে করে, বিদেশে কোনরকমে নিয়ম রক্ষা করা। কিন্তু এতদিন পরে সকলের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কুনতির এই যে পরিণতি, এর রায় দেওয়ার পূর্বে ঠাকুরজীকে একটু ভেবে নিতে হয়। এ ছোট জাতের লোকগুলোকে শান্ত করতে হবে আবার নিজের মতলবও হাসিল করতে হবে।

সে বলল, 'কুনতি অন্যায় করেছে, আবার মারপিটও করেছে। সেই জন্য ওকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হবে আর একঘরে হতে হবে। কালকেই ওকে এখানকার ঘর ছেড়ে দিতে হবে। এর বেশী বেচারী আর কি পারবে বল?'

সারা মুখে হাসির ঢেউ খেলল কুনতির। সে সকলের দিকে তাকাল।

হীরালাল জিজ্ঞেস করল, 'টাকা কোথা থেকে দেবে?'

'না পারলে আমিই এখন উধার দেব। কি বলিস্ রে বেটি?' স্নেহ ঝরে পড়ল ঠাকুরজীর চোখ থেকে।

ঝি বহুড়িদের দমটা যেন নিভে গেছে। কেবল ছেদি আর কয়েকজন বলে উঠল, 'ঠিক হয়েছে।'

হীরা জিজ্ঞেস করল আবার, 'উধার শুধবে কি করে হুজুর?'

কে একজন বলে উঠল, 'সে ঠাকুরজী আদায় করে নেবে।'

ঠাকুরজী আবার বলল, 'আর ওকে থাকার জায়গা আমিই না হয় দিয়ে দেব একটা।'

মাতাদীন শুধু শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে বলে উঠল, বাহ্বা। বলে বাহাদুরের মত তাকাল ধনিয়ার দিকে। কিন্তু ধনিয়ার মুখ অন্ধকার।

হীরালাল হঠাৎ তীব্র গলায় চীৎকার করে উঠল, 'শুনুন ভাইয়ারা' সকলেই তার দিকে তাকাল। উত্তেজনায় থমথমে মুখ হীরালালের। চোখ দুটো জ্বলে উঠল। হাত জোড় করে সবাইকে বলল, 'আর এবার থেকে আপনারা দয়া করে সকলেই ঠাকুরজীর দেওয়া জায়গাতে তসরিফ রাখবেন।' বলে সে হো হো করে হেসে উঠল। বোধ হয় হাসির দমকেই ফুলে ফুলে উঠল কুনতির শরীরটা। হীরার হাসির শব্দেই মাটিতে শোয়া তার ঘুমন্ত ছেলে চম্‌কে কেঁপে উঠল।

কেবল মাতাল বৈজু হাত ঝট্‌কা দিয়ে জড়ানো গলায় বলল, "হাঁ, ঠাকুরজী, তোমাকে আমরা দিয়ে দিলাম আমাদের কুনতিকে।'

কুনতি ঘুমন্ত ছেলেটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এ পঞ্চায়েতকে সে না মানতেও পারত। এখানকার কোন সংস্রব না রেখে সে পারত চলে যেতে। কিন্তু কোথায়? এখানকার এ মেয়ে মরদেরা তবু তাকে চেনে। শুকালুর বিধবা বহুড়ি, খুবসুরৎ বেওয়ারিশ আওরৎ সে। বস্তী থেকে তাকে চলে যেতে হবে ঠাকুরজীর ডোমবস্তীর দক্ষিণে বেশ্যা বস্তীতে। দেহ খাটানো রুজির জায়গা আর রূপ পরিবর্তন শুধু। তবু বুক তার হাহাকার করে উঠল। মাতাল বৈজুদেরই কুনতি ছিল যে সে! হ্যাঁ, এখানকার মেয়েমরদ সবাইকেই ভালবাসে

সে। জীবনের সবচেয়ে পচা জায়গাটিতে থেকেও তুনিয়াকে সে সবচেয়ে বেশী জেনে নিয়েছে।

তবু সে হাসল সবার দিকে তাকিয়ে, মেয়েদের দিকে তাকিয়ে। এ শুধু চিত্ত-বিভ্রম ঘটানো হাসি নয়, বন্ধুদের কাছ থেকে বাসা বদলের বিদায়ের হাসি। যে হাসির ধারে ধারে অশ্রুর বাষ্প জমে আছে।

তারপর অপরিসীম ঘৃণায় জ্বলন্ত হেসে ঠাকুরজীকে বলল, 'তোমার লাইনে তবে একটা ঘর বন্দোবস্ত করে রেখ।'

বলবার দরকার ছিল না সে কথা। মশালটা কয়েকবার দপ্ দপ্ করে নিভে গেল। রাত হয়েছে বেশ। আকাশে ক্ষীণ চাঁদ রয়েছে। কুনতি ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঝি বহুড়িদের দলটা স্তব্ধ, হতাশ। বুকের মধ্যে যেন দমটা ভারী হয়ে গেল আরও।

পঞ্চায়েত ভেঙে গেল। শিশু পঞ্চায়েতের সভাপতি তখন আসনের ইঁটের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মা এসে তাকে তুলে নিয়ে গেল। ভুজাওয়ালী ঘোষণা করল, কালকে যেন সবাই তার দেনা মিটিয়ে দেয়।

বৃদ্ধ মতিলালের গম্ভীর গলা শোনা গেল, তুনিয়াতে মরদ নেই।

ঘরে ঢোকবার আগেই হীরা কুনতির দিকে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'তা' হলে—'

কুনতির তিনটি চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। তার কপালের টিপটিও তার চোখ। ঘাড় বাঁকিয়ে বঙ্কিম হেসে বলল, 'তাহলে ঠাকুরজীর লাইনে।' বলে খিল্ খিল্ করে কাচের শার্সি ভেঙ্গে পড়ার মত হেসে উঠল সে। হাসির দমকে তুলে উঠল সারা শরীর।

'চুপ রহ।' প্রায় ধম্‌কে উঠল হীরালাল। কোঁচকানো ভ্রূর তলায় চোখ তুটো তার ঢেকে গেছে প্রায়। মুখের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। মনের প্রতিচ্ছবির মত সেগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

অবাক কুনতির কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। হীরালালকে অন্য মানুষ মনে হল তার। কি বলবে সে!

পঞ্চায়েতের শূন্য আসরে তাড়ির ভাঁড় আর ঘুগ্‌নির পাতাগুলো চাটছে বাড়ীর কুকুরগুলো।

কুনতির কোল থেকে ছেলেটাকে হঠাৎ নিজের কোলে নিয়ে বলল হীরা, 'ঢের হয়েছে, এবার বেরুবি চল্।'

কোথায়?

ঘরে!

ঘরে?

নয় তো কি ঠাকুরজীর লাইনে?

হঠাৎ যেন ফিক্ ব্যথায় কথা আটকে গেল কুনতির গলায়। বলল, 'তোমার ঘরে?'

হীরা বিড়বিড় করতে করতে তখন পা বাড়িয়েছে, 'না-বুঝ্ বেতমিজ আওরৎ, তবে কার ঘর?'

ঝাপ্‌সা চোখে হোঁচট খেতে খেতে মেয়ে দুটোকে নিয়ে কুনতি পথে নামল, এগুলো হীরালালের পেছনে পেছনে। ভাঙ্গাগলায় বার বার বলতে লাগল, 'বহুরূপী আদ্‌মি, কিছুতেই ওর ধাত বুঝি না আমি, কভি না।' পূবে পাহাড়ের মত পেপারমিলের সাদানীল রাবিশের স্তূপটার অন্ধকার কোল থেকে হীরার গলা আবার শোনা গেল, 'তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয়।'

দূর থেকে এ দৃশ্য দাঁতে দাঁত চেপে স্তব্ধ হয়ে দেখছিল ধনিয়া চালার ছায়া বারান্দার কোল ঘেঁষা অন্ধকারে। পেছন থেকে মাতাদীন তার পিঠে হাত দিয়ে সোহাগ করে ডাকল, 'ঘরে চলে এস মেরি মন।'

আচমকা যেন ক্লেদাক্ত সরীসৃপের স্পর্শে ঘৃণায় চম্‌কে কঙ্কন দিয়ে এক ঝাপটা কষিয়ে দিল ধনিয়া মাতাদীনের মুখে। ক্রুদ্ধ সাপিনীর মত হিসিয়ে উঠল, 'হট্ যা বুঢ়া মরদ!' তারপর ঘরে ঢুকে মেঝেয় মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। কেবল মাতাদীনের মোটা গলার সুর করে কান্নার চাপা শব্দ থেকে থেকে অন্ধকারকে হাসিয়ে তুলতে লাগল।

মান

সুখবতীর বড় ছেলে বেরজো অর্থাৎ ব্রজ এ জগৎ সংসারের এক মহাবিস্ময়। বলতে কী, এমনটি এ কলিকালে দেখা যায় না। লোকে বলে, ছেলে তো নয়, রতন। সে তুলনায়, ব্রজবিহারীর পর বনবিহারী, অর্থে বুনো। নামে কামে স্বভাবেও বুনোই। বিধবা সুখবতীর আর আর ছোট ছেলেমেয়েদের এখনো বিচারের বয়স হয়নি। সুখবতীর আসল নাম বেরজোর মা।

ছিল জাতে মালা, এখন জাত নেই। জাতের কাজ থাকলে তো জাত। তা-সে মালার ডিঙ্গি নৌকোও নেই, নেই জাল ঘুনি আটোল। সে সব ঘুচেছে সুখবতীর শ্বশুরের আমল থেকেই, তারা এখন কারখানার মজুর। ব্রজর বাপ মরেছে কারখানার তেলা মেঝেয় পিছ্‌লে গড়িয়ে, মেসিনের তলায় পা কোমর গুঁড়িয়ে।

বড় রাস্তার ধারে আবর্জনাভরা পুকুর। তার ধার দিয়ে যে সরু গলিপথটা আরও তিনটে ছায়াঘন অর্ধ কানাগলির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে, সেই পথের ধারে ছিটে বেড়া আর খোলার ছাউনির নসীরামের বস্তি। বার মুখো ঘরের নীচে, স্যাঁতানো সরু পথে যখন ব্রজর মরা বাপকে, সুখবতীর সোয়ামীকে, এনে শোয়ালে, তখন সুখবতী বুক চাপড়ে চুল ছিঁড়ে কেঁদে চেঁচিয়ে আর বাঁচে না।

ভোরবেলা উঠে ব্রজ মা'কে প্রণাম করে যখন বললে, 'মা তোমার বেরজো রয়েছে, ভাবনা কী,' তখন যেন সুখবতীর পাষাণভার অনেকখানি নেমে গেল।

হ্যাঁ, এমনি ব্রজ, জাতে মালা, থাকে বস্তিতে, তবু এক মহা বিস্ময় সে। হিরণ্যকশিপুর ঘরে প্রহ্লাদ, অসুরের ঘরে দেব-সুত। সে ভোরবেলা উঠে ভগবানকে স্মরণ ক'রে মায়ের পাদোদক খায়, গঙ্গায় যায় নাইতে; ফোঁটা দেয় কপালে গঙ্গামাটির, জল দেয় তুলসীতলায়, দিয়ে আবার মাকে প্রণাম করে।

সুখবতী মরমে ম'রে যায়। ভাবে, এ ছেলের মায়ের যুগ্যি নয় সে। নিজেদের জাত বংশে দূরে থাক, এ যে বামুন কায়েতকেও হার মানায়।

ব্রজর নেই নেশা ভাঙ, নেই মুখে দুটো কটু কথা। ছেলে মুখ তুলতে জানে না, হাজার চড়ে সুখবতীর এ ধম্মিষ্টি ব্যাটার মুখে রা নেই। বোল্‌তার ঠাস বুনোন চাকের মতো এ বস্তিতে হাজারো ইতরের বাস, হাঁকাহাঁকি, খিস্তিবাজী, নোংরামি, ঝগড়া, যেন গুল্‌জার করা নরক। কিন্তু কেউ কোনদিন এদের সঙ্গে একটা কথা বলতে দেখেছে ব্রজকে? নাওয়া, খাওয়া, শোয়া, এ ছাড়া ব্রজ এ তল্লাটে থাকে না। তার বন্ধু-বান্ধব সব ভদ্র-পাড়ায়, বামুন-কায়েতের লেখাপড়া-জানা অবস্থা-পন্নদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব।

বস্তির সবাই সসম্মানে ব্রজর কাছ থেকে দূরে থাকে, হিংসে করে সুখবতীর পুত-ভাগ্যিকে। মায়েরা বলে ছেলেদের, 'ব্রজর পাদোদক খেয়ে তোরা মানুষ হ'।'

পাওয়ার হাউসের সি, এ, পার্সেনের কণ্ট্রাক্টরের আণ্ডারে কাজ করে ব্রজ। বাঙ্গালি ফোরম্যান সাহেবও বড় ভালোবাসেন ব্রজকে। খালাসী তার ডেজিগ-নেশান, কিন্তু কাজের বেলায়, ফাইল খাতা বাছগোছ্ করা, মেশিনের নম্বর টোকা। একটু আধটু লিখতে পড়তেও জানে সে। তার অমায়িক ভদ্রতায় ফ্যোরম্যান খুশি, প্রতিদানে মর্যাদাও দিয়েছেন, আশাও দিয়েছেন ভবিষ্যতে তাকে বাবু ক'রে দেওয়ার, মানে কেরানি।

পার্সেনের ব্রজর সব খালাসী মজুররা এতে অস্বাভাবিক কিছু দেখে না। সত্যি, ব্রজ তাদের তুলনায় বড়ই। সে ভদ্রলোক। ফলে তাদের সঙ্গে পোট খায় না।

ব্রজ অজাতশত্রু। এক কথায়, দেশে গুণে এমন ছেলে আর হয় না।

সুখবতী নাম সার্থক এ-সৌভাগ্যে। আবার দুর্ভাগ্যজনিত অশান্তিরও অন্ত ছিল না তার ছোট ছেলে বুনোকে নিয়ে।

বুনো তার শক্ত রুক্ষ মস্ত শরীরটা নিয়ে দুম্ দাম্ ক'রে আসে, গুপ্‌গাপ্ করে খায়, ঘরে বাইরে গলাবাজী ক'রে ঝগড়া করে, মারামারি করে, গলা ফাটিয়ে হাসে, গান করে, মুখ খারাপ করে। তার কোনো কিছুতে ঢাকাঢাকিও নেই, চাপাচাপিও

নেই। উদ্ধত অবিনয়ী। 'মা'-ডাকে তার মধু ঝরে না, যেন মাকে খেঁকিয়ে ওঠে। তেলচিটে এক মাথা চুল নিয়ে, মুখে বিড়ি নিয়ে সে কারখানায় যায়, তারপর এখানে সেখানে ঘোরা ফেরা। বস্তির সকলের সঙ্গে তার এ-বেলা ঝগড়া, ও-বেলা ভাব। মর্জিমতো ছোট ভাই-বোনদের কখনো ঠ্যাঙাচ্ছে, আবার কখনো আদরের ঠেলায় অন্ধকার। সুখবতীর সুখ নেই, সারাদিন 'বুনো রে' 'বুনো রে' ক'রে তার পিছে পিছে ফিরছে, কখন কী অনাছিষ্টি বাধিয়ে বসে সেই ভয়ে। হারামজাদা যে যমেরও অরুচি!

কপালগুণে দোষ পায়। একই পেটে তার দেবাসুর ঠাঁই পেল কেমন ক'রে! সুখবতীর চেঁচামেচির, গালাগালির অন্ত নেই বুনোকে ঘিরে।

বুনোর বন্ধুরাও সব ডাকাবুকো। তাদের আচার বিচার নেই। কেউ কেউ নেশাভাঙে সিদ্ধহস্ত। ভদ্রপাড়ায় মান দূরে থাক, আনাগোনাও নেই।

সেও খালাসীর কাজ করে পার্সেনে। ব্রজর মতো তার খাতির নেই। কি গ্রীষ্মের পোড়া দুপুরে আর কি শীতের ভোরের তুহিন ঠাণ্ডায় সে টুকটাক ক'রে বেয়ে ওঠে ইমারতের লোহার ফ্রেমের উপর। ছ' ইঞ্চি রেলিং-এর উপর সমস্ত শরীরের ভার দিয়ে পাঁচ পাউণ্ড ওজনের রেঞ্জ দিয়ে স্ক্রু আঁটে আর হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে গান গায়ঃ

দেখে তোমার চাঁদ মুখ
পরাণে ধরে না সুখ।

নীচে থেকে ব্রজ অবাক মানে। এই অবস্থায় সে গান গায় কি ক'রে। আবার মানও যায়। এ-সব যে অসভ্যের অনাচার।

ব্রজ বাবু হবে। বুনোর কাছে সেটাও বিস্ময়। বলে আমার পেটে বোমা মারলেও লম্বর টোকা ফোকা হবে না বাবা। আমি হব ফিটার।

ব্রজর পাদোদক খাওয়ার কাহিনী এ-অঞ্চলে বিখ্যাত। বুনোকে কেউ যদি বলে, 'তুইও কেন খাস্‌নে', বুনো খিলখিল ক'রে হেসে বলে, 'আমার মাইরি লজ্জা করে'। বলে, 'শালা সং-এর ঢঙ্'।

মাসের শেষে ব্রজ মাইনে পেয়ে সব মায়ের হাতে তুলে দিয়ে পরে হাত পেতে

চেয়ে নেয়, 'মা দুটো টাকা দেবে গো?' বুনোর ও-সব নেই। সে টাকা দুটি পকেটে রেখে বাকিটা মায়ের হাতে ফেলে দেয়। দিয়ে বলে, 'কিপটেমি ক'রো না। আজ এট্টুস মাছ খাইও।'

সে খালি সইতে পারে না ব্রজর তুলনা। কিন্তু তার মা প'ড়ে প'ড়ে সারা দিন তার পেছনে খালি খোক্ কাটবে, 'ব্রজ এই, ব্রজ সেই, আর তুই হারামজাদা—'

ব্যস, আর বলতে হবে না। আরম্ভ হয়ে যাবে বুনোর বুনো ঝগড়া আর গালাগাল। আর ঝগড়ায় তো সুখবতীও কম নয়। সোয়ামী বেঁচে থাকতে রোজ ঝগড়া ছিল, এখন সেটা বুনোর সঙ্গে। এ ড্যাকরা যে বাপেরই মতো কুচাল পেয়েছে।

আর সইতে পারে না বুনো ব্রজর শাসন। ব্রজ যদি বলে, 'বুনো এটা করিস্‌নে,' বুনো সটান জবাব দেবে, 'তোর নিজের চরকায় তেল দি'গে যা।'

এই সেদিন এক কাণ্ড ঘটলো। পার্সেনের কণ্ট্রাক্টরি কাজ মানেই হলো পাওয়ার হাউসের মতো ও-সব রাক্ষুসে কারখানা তৈরি করা। আর যত ওচা কাজ হলো খালাসীদের। সেদিন একটা খালাসী কী কথায় ফোরম্যানকে বলেছে, শরীরটা তার খারাপ, আজ সে উপরে উঠতে পারবে না।

অমনি ফোরম্যান খিঁচিয়ে উঠলো, 'হারামজাদা, পারবিনে তো চাকরি ছেড়ে দে।'

সামনে ছিল বুনো। সে হেঁড়ে গলায় গাঁক ক'রে উঠল, 'গালাগাল দিচ্ছেন কেন মশাই?'

ফোরম্যান তো থ। ছোঁড়া বলে কী? মুখের পরে কথা? সে-খালাসীটাকে উপরে উঠতে হলো না বটে, কিন্তু বুনোর চাকরি যায় যায়।

ব্রজ এসে ভাইকে বুঝিয়ে বল্‌লে, 'ছাখ্ ভাই, ওদের মুখে সব মানায়, তোর মুখে নয়। মাপ চেয়ে নে।'

বুনো এক কথা বললে, 'ছাখ্ বেরজা, আর একটা কথা বলবি, ঠেঙ্গিয়ে তোর খপ্‌ড়ি ওড়াবো।'

সে-যাত্রা ব্রজর ভাই ব'লেই বোধ হয় বুনোর চাকরিটা গেল না। কাটা গেল

সাত দিনের রোজ আর জন্মের মতো সুখবতীর মুখে রপ্ত হ'য়ে গেল তার প্রতি এ খোঁটা। তাও খেতে শুতে বসতে।

ভোর হয় হয়। আকাশে ফুটছে নীলের আভাস। তা ব'লে নসীরামের বস্তিতে অন্ধকার ঘোচে না। আর ঘরের ভিতর তো অমাবস্যা। দুপুরবেলা কয়েক ঘণ্টা একটু আলো। তারপরেই আবার যে-কে-সেই।

ব্রজই সকলের আগে জাগে। ডাকে, 'মা মাগো!'

গলা যেন মধুভরা। আর কি মিষ্টি ডাক। সে-ডাকে সুখবতী জাগে। ব্রজ ঘটির জলে মায়ের পা ছুঁইয়ে খায়, তারপরে চ'লে যায় গঙ্গায়।

আগে আগে সুখবতীর লজ্জা ও ভয় করতো এমনি ক'রে জলে পা ছুঁইয়ে দিতে। এখন অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে। মনে প'ড়ে যায় শ্বশুরের কথা। ব্রজর ঠাকুর্দা। ব্রজ তার প্রথম নাতি, আদরেরও বটে। সে-ই ব্রজকে হাত ধ'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে সাধু সন্তদের আড্ডায়, বাবু ভদ্রলোকদের সৎ মজলিসে, কথকঠাকুরের সভায়। সেই থেকেই আস্তে আস্তে দেখা দিল ব্রজর এমনি মতিগতি। ভয়ও হয় সুখবতীর, ছেলে না তার আবার বিবাগী হয়।

না, ভাবলে চলে না। সে ডাক দেয় বুনোকে। এক ডাকে তো এ অনামুখো একদিনও জাগবে না। যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম। অনেক ডেকে ডেকে যখন সুখবতী খেঁকিয়ে উঠলো, 'ওরে হারামজাদা লবাবপুত্তুর, তোর কোন্ কেনা বাঁদী আছে রে ডেকে দেওয়ার?'

অমনি লাফ দিয়ে উঠল বুনো। যেন এই কথাগুলো না হ'লে তার ঘুমন্ত মরমে পশে না। উঠল হাসিখুশি মুখ নিয়ে। কিসের যে এত খুশি তা সে-ই জানে। হয় তো নিদ্রাটি বেশ জমাটি হয়েছে।

ও মা! তারপরে কথা নেই বার্তা নেই, পা ছড়িয়ে ব'সে সে গান ধরলো :

আমার সুখ হল না দুখে মরি,
ওগো, তোমার ঘর ক'রে।

উনুন ধরাতে গিয়ে সুখবতীর পিত্তি জ্ব'লে যায়, পিত্তি জলে যায় আশে-পাশের ঘরের লোকের, এ-ঘরে ছোট ছোট ভাইবোনগুলোর ঘুম ভেঙে যায়।

সুখবতী চেঁচিয়ে ওঠে, 'হারামজাদা, তোর গানের নিকুচি করেছে। সকালবেলা—'

তাতে বুনোর আবেগ বাগ মানে না, হাত জোড় ক'রে গায় ঃ

সখী, তুমি আগ ক'রো না।

সুখবতী রাগে ঘৃণায় অন্ধ হ'য়ে চীৎকার ক'রে ওঠে, 'শুয়ার, আমি তোর সখী হলুম ?'

বুনো তাড়াতাড়ি নিজের মুখে চাঁটি মেরে বলে, 'থুড়ি থুড়ি, তুমি আমার মা।' আবার,

মা গো, তুমি আগ ক'রো না।

ততক্ষণে সুখবতী একটানা ব'লে চলেছে, 'তুই মর্ মর্ মর্ . '

বুনো বলে সুর ক'রে,

যম যে তোমার চোখ-খেগো গা—

পরমুহূর্তেই তেলের বাটিতে কোনোরকমে আঙ্গুলটা ছুঁইয়ে, সেটুকুন মাথায় ঠেকিয়ে চ'লে যায় পুকুরের দিকে। কিন্তু রাস্তা দিয়ে যায় না। যায় বস্তির পেছন দিকের ঘাটে ; যায় না, তাকে টানে ওই ঘাটে।

পুকুরের ধারে, যেখানে বস্তির পেছনটা বেঁকে পড়েছে, সেখানে একটা ঘরে থাকে মাদ্রাজী খ্রীস্টান পরিবার। মা বাপ আর বড় মেয়ে কারখানায় কাজ করে। মেজ মেয়েটা সাহেব বাড়ির ঝি। সেই মেয়েটা, কালো বটে, তবু ভারী সুন্দর। আর কাজ কর্ম করে বটে কিন্তু সব সময়ই থাকে বেশ পরিষ্কার ধপধপে হয়ে। মেয়েটা বুনোর দিকে ঠেরে ঠেরে তাকিয়ে না-হক্ কেবলি টিপে টিপে হাসে! বুনো প্রথমে চটতো, ভাবতো বুঝি অবজ্ঞা ক'রে বিবিগিরি দেখাচ্ছে তাকে।

কিন্তু এখন, বুনো মনে মনে বলে, এ আবার শালার কি ফ্যাসাদ, তবু ওই না-হক হাসি না দেখতে পেলে তার প্রাণ মানে না! আর মেয়েটাও ভোলে না ওই এঁদো পুকুরের পাড়ে হাজিরা দিতে।

বুনোর পক্ষে হৃদয়ের এ আবেগ চাপা মুশকিল। কিন্তু ব্রজর কাছে এ-ব্যাপার অকল্পিত। একে তো সে এ-যুগের বিত্তহীন, তার আশাটা হলো এ-সমাজের

মধ্যজীবীর ভদ্র জীবনযাত্রা ও ধর্মের একনিষ্ঠতা। তার চারপাশে ভয় ও সংশয়ের প্রাচীর খাড়া, প্রতিটি পদক্ষেপ নিঃশব্দ নম্র সন্ত্রস্ত।

ব্রজ এল চান ক'রে। তাদের উঠোন নেই, আছে রান্না করবার এক ফালি বারান্দা। সেখানেই ব্রজ রেখেছে তুলসীগাছের টব। সে এসে জল দিল তুলসীতলায়। প্রণাম করল মা'কে। তারপর চা খেতে খেতে বললো, 'হ্যাঁ মা, তুমি নাকি ঘোষ কর্তাদের দোকানে গে ঝগড়া ক'রে এসেছ?'

সুখবতী কথাটা বোধ হয় চাপতে চেয়েছিল। বললো, 'তা করেছি বাবা। করব না? ছ প'সার তেল, তাও ওজনে মারবে?'

'মারুক, ওদের ধম্মো ওদের কাছে।'

কথাটা সুখবতীর মনঃপূত নয়। তবু ব্রজ যখন বলছে! বলল, 'কিন্তু গাল দিলে যে?'

'দিক, তাতে কী।'

নির্বিরোধ ব্রজ, নির্বিকার তার গলা। তার জীবনের কোথাও প্রতিবাদ নেই, আছে মানিয়ে চলা। সুখবতী চুপ ক'রে থাকে।

বুনো নেয়ে আসতেই ব্রজ বললো, 'হ্যাঁ রে বুনো, কাল তুই মিত্তির ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্।'

বুনো বললো গা মুছতে মুছতে, 'হুঁ, ঝগড়া আবার কি! পরের পেছনে কাটি দেওয়া কেন?'

'কেন, তোকে কী বলেছে?'

বুনো বললো, 'কী আবার। কাল সন্ধেয় কারখানা থেকে আসছি, বাড়ির সামনে চার মণ কয়লা দেখিয়ে বললে, হেই বুনো, কয়লাগুলো এট্টুস বাড়িতে তুলে দে তো। যেন আমি ওর বাপের চাকর। বললুম, নিজেরা তুলে নাও না মশাই। তো ডাক্তার বললে আমাকে, তোর তো হারামজাদা খুব তেল হয়েছে। হাঁকতুম এক ঘুষি। খালি ব'লে দিলুম, আবার যদি হারামজাদা বলো, তোমার ওই মুখ থুবড়ে দোব।'

কথাটা শুনে যেন আঁতকে উঠলো ব্রজ। বুঝি সুখবতীও। ব্রজ বললো,

'তা কয়লাটা তুলে দিলেই হতো। আমাদের বাপ দাদা ও-রকম কত দিয়েছে।'

'দিয়েছে তো দিয়েছে। ও-সব ভদ্দর পীরিত তুই কর্‌গে যা।'

ব্রজ তবু বললে, 'তোর মাপ চাওয়া উচিত।'

'তোর কথায়।' ভেংচে উঠল বুনো। 'ছাখ্ বেরজা, মন্তর দিস্‌নে। তোর কাজ তুই কর্।'

মন্তর মানে উপদেশ। ব্রজ তাকে ছেড়ে মাকে ধরলো, 'ডাক্তার বাবু কত কথা বললেন। তা সে একটা মিলের ডাক্তার। আজকেই ফোরম্যানকে ব'লে তোর চাকরি খেয়ে দিতে পারে। গরীবের ছেলেকে কত সইতে হয়।'

এ-সব কথায় বুনোর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'গরীব ব'লে কি মান নেই? এতে যদি চাকরি যায় তো যাক। তবে তোর ফোরম্যানকেও দেখে লোব। আর তুই যদি ফের আমাকে তাতাবি—'

এবার হামলে পড়ে সুখবতী। চাকরি যাওয়ার কথাটা শুনে ভয়টাই তার রাগের চেহারায় দেখা দিল, বললো, 'তাতে তোর কি আছে রে ড্যাকরা। তোর জ্বালায় কি আমাদের মরতে হবে। চাইবি, ক্ষ্যামা চাইবি পায়ে প'ড়ে।'

উভয় পক্ষ থেকেই নিরাশ হ'য়ে বুনো তার মেজাজের শেষ সীমায় পৌছুল। চীৎকার ক'রে উঠল, 'তোমাদের দায় থাকে তো তোমরা চাও গে···আর রইল শালার সংসার আর চাকরি আর ভদ্দরের কুটুম্বিতে।'

ব'লে সে দুম্ দুম্ ক'রে ঘরে ঢুকে জামাকাপড় প'রে হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে গেল। না খেল রুটি, না চা।

ব্রজ কারখানায় এসে দেখল, বুনো সত্তর ফিট উঁচুতে নতুন চিমনির গায়ে বল্টু ঠুকছে।

এই নিয়েই বারোমাস অশান্তি। ব্রজ রোজ এসে বলে, আজ ফোরম্যান এই বলে, কাল কারখানায় এই হয়েছে, বাইরে সেই হয়েছে। আর সুখবতী রাতদিন বুনোকে খিঁচোয়।

বুনো মাথা নোয়ায় না। সে যেন তাদের খালাসীদের শক্তিতে তোলা ওই একশো ফিট উঁচু চিমনিটার মতো সটান ও উদ্ধত। মেঘ ঝড় বৃষ্টিতে সে অবিচল। বলে, 'খাটব—খাব; যেমন আয়নাটি দেখাবে, তেমনি মুখটি দেখবে; কাজ শিখেছি ফিটারের, তুমি বলবে মাইনে বাড়াব না, ফিটারের কাজ কর। কেন? সে হবে না।'

সে হবে না ঠিক, কিন্তু মনের কোথায় যেন খচ্ ক'রে ওঠে। ভাবে, ফোরম্যান শোধ তুলতে পারে। তবু ভাবে, ও যদি শোধ তোলে, আমরা প্রতিশোধ নিতে পারব না?

ব্রজর উন্নতি হয় কাজে। সে সত্যি কেরানির কাজ পায়। তার মান বাড়ে। বাড়ে সুখবতীরও। সে যে বাবু ছেলের মা। এতে বোধ করি বুনোরও একটু গোপন গৌরব-বোধ ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে সে-বোধের অধিকার নেই। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে আপোসহীনতা যেন তার কলঙ্ক। ব্রজ যে তার গৌরবের ভাগ তাকে দিতে রাজী নয়।

এর পর থেকে বুনোকে নিয়ে অশান্তি আরও বাড়ে, ব্রজর দাবী তার চেয়েও বেশী। পাড়া বয়ে লোক শোনাতে আসে ব্রজর কথা। সেই সঙ্গে বুনোর কথাটা বলতে কেউ ভোলে না।

একদিন সেই মাদ্রাজী খ্রীস্টান মেয়েটি ভাঙ্গা বাংলায় বললে, 'তুমি বড় গোঁয়ার।'

বুনো অমনি হাসি ভুলে মাথা সটান ক'রে দাঁড়ালো। এ-মিথ্যে অপবাদ সে মানতে রাজী নয়। বললে, 'আ ম'লো, গোঁয়ার কোথা দেখলে?'

মেয়েটি বোধ হয় তার প্রেমের অধিকারেই বললো, 'সবাই বলে। তোমার দাদা কেমন ভদ্র, কারুর সঙ্গে'—ব্যস্, আর বলতে হলো না। ব'লে দিল, 'তা হলে দাদার সঙ্গে পীরিত করলেই পারো।'

ব'লে গামছাটা কোমরে ক'ষে বাঁধতে বাঁধতে সে আপন মনেই বলতে লাগলো, 'রইল শালার পীরিত, নিকুচি ক'রেছে তোর ভালর। এ মেয়ের জন্য শালা আমি রোজ এঁদো পুকুরে ডুবতে আসি!'

সে হন্-হন্ ক'রে চ'লে গেল বড় রাস্তার মিউনিসিপ্যালিটির জলকলের দিকে।

মেয়েটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে তাড়াতাড়ি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলো। তার দক্ষিণী টানা চোখে বড় বড় ফোঁটায় জ'মে উঠলো প্রেমের প্রথম অশ্রু।

সারাদিন বুনোর মনটা দ'মে রইলো কারখানায়। বুকের ভিতরটা কেন যে এ-রকম করছে, সে বুঝলো না। ভেবে পেল না, এ-সংসারে কি ব্যতিক্রমটা সে করেছে।

বিকেলে ব্রজর পিছন পিছন বাড়ি এল।

বাড়ি আসতে না আসতেই মিত্তির ডাক্তার প্রায় আধন্যাংটো হয়ে কোমরে কাপড় গুঁজতে গুঁজতে রুদ্রমূর্তিতে ছুটে এল।

ব্যাপার হয়েছে, তার বাড়ির সামনেই মুখুজ্জেদের দুই পুরুষ আগের একটা ভাঙা ভিটা প'ড়ে আছে। কিছুই নেই, আছে শুধু ইঁট বের-করা গোটা দুই ঘরের দেয়াল, তাতে ইঁদুর আর সাপের বাস। সেটা মিত্তির কিনেছে। সুখবতীর অপরাধ, সেই দেয়ালে সে ঘুঁটে দিয়েছে, দেয়-ও রোজ। বোধ করি দু' একদিন বারণও করেছে। কিন্তু সুখবতী জানে, প'ড়ো দেয়াল, সে না দিলেও অন্য কেউ দেবেই।

কিন্তু মিত্তির একেবারে উগ্র মূর্তিতে চীৎকার করতে করতে ছুটে এল, 'কোথায় সে হারামজাদা ছোটলোক মাগী, তাকে একবার দেখি।'

ভীত সন্ত্রস্ত ব্রজ একেবারে মিত্তিরের পায়ে গিয়ে পড়লো, 'কি হয়েছে কাকাবাবু, আমাকে বলুন।'

বুনো চম্‌কে বন্য বরাহের মতো কাত্‌ হয়ে মিত্তিরের দিকে তাকালো। সুখবতী ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক।

মিত্তির কোনো রকমে তার বক্তব্য ব'লে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'এত বড় সাহস ছেনাল মাগীর, আমি বারণ ক'রেছি তবু—'

'এই অভাবনীয় ব্যাপারে ব্রজ অসহায়ের মতো ব'লে উঠলো, 'এবারটা ছেড়ে দেন, ক্ষমা করেন। মা আমার বুঝতে পারেনি।'

সুখবতী শুধু বললো, 'ভাঙা প'ড়ো দেয়াল বাবু, তাই—'

মিত্তির রুখে উঠলো, 'হাজার ভাঙা হোক, তোর কী? কথায় বলে, ছোটলোক কখনো—'

বুনো আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না। বলে ফেললে, 'ওই ভদ্দর গালাগালগুলোন আর দেবেন না মশাই।'

ব্রজ ব'লে উঠলো, 'বুনো, চুপ!'

কিন্তু মিত্তিরের রাগ চড়লো। সে চেঁচাতে লাগলো, 'কেন দেব না। যার যেমন, তার তেমন। ছেনালকে ছেনালই বলবো।'

ব্রজ দুই হাত জোড় ক'রে বললো, 'আর নয়, কাকাবাবু, আমি মাপ চাইছি এদের হ'য়ে, আমি মাপ চাইছি।'

মিত্তিরের এত রাগের অন্তঃস্রোত ধরা মুশকিল ছিল। সে বুনোর দিকে একবার দেখে যেন জেদ ক'রে ব্রজকেই বললো, 'আমি বল্‌ছি, তোর মা—ছেনাল।'

ব্রজ আবার হাত জোড় করার উদ্যোগ করতেই সবাই দেখল, বুনো চকিতে ছুটে এসে ব্রজর হাত দুটো মুচড়ে ধ'রে একেবারে তার পায়ের কাছে আছ্‌ড়ে ফেললো। হিসিয়ে উঠলো সে, 'তুই হতে পারিস্ ছেনালের ছেলে, বুনো নয়, বুঝ্‌লি।'

তারপর চোখের পলক না পড়তে সবাই দেখলো, মিত্তিরের সামনের দাঁত দুটো নেই, আর মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে তার রক্ত পড়ছে। মৃত্যু-চীৎকার জুড়েছে সে। তার সামনে ক্ষিপ্ত নির্বাক যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে বুনো।

তারপর সে এক কাণ্ড। সুখবতীর চীৎকার, বস্তির হট্টগোল ও হা-হুতাশ, এক এলাহি ব্যাপার।

ঘণ্টাখানেক পরে, ভাঙ্গা আসর থেকে বুনোকে ধরে নিয়ে গেল পুলিস। মামলা পরে, এখন হাজত-বাস তো হোক। সুখবতী যদি পারে, জামিনের যেন চেষ্টা করে।

সুখবতী উঠলো। বুঝলো, বুনোকে ছাড়াতে অক্ষমতা তার কতখানি। তবু ভাঙা গলায় খালি বললো, 'কতদিন, তোকে কতদিন বলেছি।'

বুনো একবার ফিরলো। ব্যাপারটা যেন এখনো তার কাছে পুরো বোধগম্য

হয়নি। কেবল বুকের ভিতরটা কেমন করতে লাগলো মায়ের দিকে ফিরে। কথা বললো না, কেবলি বুকটার মধ্যে কী হতে লাগলো, তবু অনুশোচনার কোনো কারণ নিজের মনে সে খুঁজে পেল না।

কেবল সেই মাদ্রাজী মেয়েটি ভাবলো, আমিই ওর মনটা আজ ভেঙে দিয়েছি, তাই। দক্ষিণের সমুদ্রের অথৈ জোয়ার ওর চোখে।

ভোর হবো-হবো। আকাশে আলো দেখা দেবে-দেবে করছে। রাস্তায় আলো নিভে গিয়েছে। নসীরামের বস্তি জাগছে।

ব্রজ জেগেছে। ডান হাতটা তার সত্যি ভেঙে গিয়েছে। সে মাকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। দেখলো, মা জেগেই আছে। জেগে ব'সে আছে। একলা। চুপচাপ।

ব্রজ রোজকার মতো জলের ঘটি নিয়ে এল। পা ছোঁয়াতে গেল মায়ের।

হঠাৎ সুখবতী ঘটিটা নিয়ে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, 'ছেনালের পা ধোয়া জল খাবি, তোর মান যাবে না? তোর লজ্জা করে না? আমি যে ছেনাল।'

ব্রজ অবাক। আশ্চর্য, তার মাও সত্যি ছোটলোক, সেই মালা-ঘরনি বস্তিবাসিনী সুখবতী।

সুখবতী তার রাতজাগা চোখ দুটোতে জল দিয়ে বাইরে এল। গলির মোড়ের দিকে মুখ ক'রে খালি বললো, 'এ সংসারের ধারা বুঝিস্‌নে,...তোকে কতদিন বলেছি, কতদিন...।'

ব্রজ অপ্রতিভ নেংটি ইঁদুরটার মতো অন্ধকার ঘরের মধ্যে চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে লাগলো।

কেবল সেই মেয়েটি এঁদো পুকুরের ধারে গিয়ে নির্জন বড় রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরেই ওই খালি রাস্তাটাতে কারখানাগামী লোকের আনাগোনা শুরু হবে।

উজান

'শালাদের খালি গান, ফুর্তি, গল্প, ঝগড়া। নিকুচি করেছে তোর—'

ফুঁসতে ফুঁসতে, ঘরের নিরালা কোণের অন্ধকার ছেড়ে প্রায় একটা ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মত এসে নারাণ বেমালুম দুই থাপ্পড় কষালে গাইয়ে বেচনের গালে।

বেচনের সঙ্গে সমস্ত আসরটাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল ক্ষ্যাপা নারাণের দিকে। একে শনিবারের সন্ধ্যা, তায় কাল কারখানায় রবিবারের ছুটি। আসরের আর দোষটা কি?

দোষ নারাণেরও বা কোথায়? একে লোকজনই সহ্য হয় না, তায় আবার গান বাজনা, ঢলাঢলি, হাসাহাসি।

এই আধো অন্ধকারে নারাণকে একটা সাংঘাতিক কিছু মনে হয় না। মনে হয় যেন একটা ভূতে পাওয়া মানুষ। চোখে তার ক্ষিপ্ততা নেই, আছে অসহ্য চাপা যন্ত্রণার ছাপ। গোঁফ জোড়া অনেক দিন কাটছাঁট না হওয়ায় অসমানভাবে ঝুলে পড়েছে। মুখের হাড় বেরিয়ে, বাঁকা চোরা অনেকগুলো রেখা সুস্পষ্ট হয়ে তাকে একেবারে বুড়ো করে ফেলেছে এ বয়সেই।

সে চাপা গলায় প্রায় টেনে টেনে আর্তনাদ করে উঠল, 'শালার জগতে লোক-জন, গাড়ি-ঘোড়া, কলকারখানা, গান, সোহাগ আর কাঁহাতক সওয়া যায়? পঙ্গপালের জাত এ মানুষগুলোন শালা একদিনে সাবাড় হয় না কেন? অ্যাঁ, কেন হয় না?'

কিন্তু বেচন ছেড়ে দিলে না। সে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে সজোরে এক ঘুষি মারলে নারাণের মুখে।—'শালা, তবে যা না, সাধু হয়ে বনে বনে ঘোরগে। এখানে কেন?'

সবাই ভাবলে এখুনি একটা মারারারি শুরু হয়ে যাবে এবং একটা সোরগোলও উঠল সেই রকমের। কিন্তু কিছুই হল না। কারণ, নারাণ একেবারে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল মুখে হাত দিয়ে।

আসলে সে তো মারামারি করতে আসেনি, এসেছে আর চুপ করে থাকতে না পেরে। মানুষের কোন কিছুই যে তার আর সহ্য হয় না। কোন বন্ধুর দুটো কথা বল, মেয়েমানুষের একটু হাসি মস্করা বল, ছা পোনার একটু সোহাগ বল, মায় কারখানা, কাজ, বস্তি কিছুই ভালো লাগে না। মানুষের সমাজ তার কাছে বিষের মত লাগে। অথচ সে একটা কাজের মানুষ। বনস্পতি ঘিয়ের কারখানায় সে কাজ করে। হাঁকে, ডাকে, হাসিতে, গানে সেও কিছু কম ছিল না।

তবে হ্যাঁ, তখন তার বউ ছিল, তিনটে ছেলে-মেয়ে ছিল। আর বউটা ছিল যেমনি চেহারায় শক্ত, তেমনি এক মুখেই কত কথা, ঝগড়া, হাসি, সোহাগ। তিনটে ছেলে-মেয়ে কাছে কাছে ঘুরত, যেন ধাড়ি শূয়োরের পায়ে পায়ে ফেরা বাচ্চাগুলোর মত।

সেগুলো বছর ভরে ভুগল, পাকিয়ে পাকিয়ে গেল। তারপর মরল একটা একটা করে। আগে যেমন রাগলে নারাণ বলত, 'তোরা মলে আমার হাড় জুড়োয়' ঠিক তেমনি করে মরল। কিন্তু একে ঠিক হাড় জুড়ানো বলে কিনা, সেটা ঠাউরে উঠতে পারল না।

সেই থেকে মানুষই যেন তার কাছে বিষ হয়ে উঠল। মানুষকে সে ঘৃণা করে। গান বাজনা তো দূরের কথা, কোন বউ সোয়ামীকে এক রত্তি হাসতে দেখলে তার ঠ্যাঙাতে ইচ্ছে করে। আসলে, এ সবই তার কাছে মিথ্যে, ভাঁড়ামি, শয়তানি!

কে নারাণের নাম ধরে ডাকতেই সে আসরের সকলের দিকে তাকিয়ে দেখল। এর মধ্যে অনেকেই তার প্রাণের বন্ধু, বেচনও তাই। আর সকলেই তার দিকে করুণাভরে তাকিয়ে আছে যেন সে কেমন অসহায় অস্বাভাবিক একটা জীব। ঝি-বউরা এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন মরদ নারাণের সব শোক পারলে ওরা এখনি হরণ করে নিত।

এতগুলো চোখকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঘৃণায় যন্ত্রণায় রি রি করে উঠল তার গায়ের মধ্যে। এখনি হয় তো সবাই তাকে সান্ত্বনা দিতে আসবে, যেন কতই ভালবাসে।

পিশাচতাড়িতের মত সে সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সর্বত্রই মানুষের ভিড়, হাসি, গান, কান্না, মার, ধোর, হল্লা, যেন প্রেতের তাণ্ডবলীলা, জানোয়ারের সংসার!

শেষটায় সে গেল বাবুসাহেব দীনদয়াল সাহুর কাছে তার ধাপার মাঠের কাজের জন্য। সে জানত বাবুসাহেব এক জোড়া লোক খুঁজছে, স্বামী আর স্ত্রী। নারাণ জোর দিয়ে বলল, সে একলাই সব কাজ করতে পারবে, তবু মাঠের কাজটা তার চাই-ই। যতই অল্প পয়সা হোক, একটা পেট তো! দুনিয়াতে সে কার ধার ধারে? দীনদয়াল ভারী অবাক হলেও কাজটা দিয়ে দিল।

পরদিনই নারাণ তার খুঁটিনাটি জিনিসপত্র নিয়ে, ইয়ার-বন্ধুদের হাজার অনুরোধ উপরোধ ঠেলে, অমন একটা ভাল কাজ ছেড়ে চলে গেল পূবের জনমানবহীন শূন্য মাঠে।

শহর ছাড়িয়ে রেল লাইন। এপারে ময়লা বিশুদ্ধীকরণের যন্ত্রঘর, ওপারে চারটে বড় বড় পুকুর, তাতে চালান যায় যন্ত্রের ভেতরের সব নির্দোষ শেষাংশটুকু। তারপরেই মাঠ, লোকে বলে ধাপা।

তার পূব সীমানায় একখানি মেটে ঘর। আরও খানিক পূবে মিউনিসিপ্যালিটির সীমান্ত ধরে সুদীর্ঘ গভীর খাদ কাটা। তার ধারে কতগুলো মরকুটে খেজুর আর কুল গাছের সারি, একটা ধান ক্ষেতের সীমানা। সেটাও পূবে আর উত্তর দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত, তার ওপারে ধূ ধূ করে একটা গাঁয়ের কালচে রেখা।

দীনদয়াল সাহু এবার মাঠের ডাক নিয়েছে, উদ্দেশ্য তরকারি ও পুকুরে মাছের চাষ। চাষ বলতে বেগুন, কপি ইত্যাদি।

এখানে এসে বিস্ময়ে ও আনন্দে নারাণ যেন মাতাল হয়ে উঠল। তার ছোট্ট ঘর, পাশে বিস্তৃত একটি মাত্র পিটুলি গাছ! তারপর যে দিকে চাও শুধু মাঠ আর মাঠ। লোক নেই, জন নেই, নিঃশব্দ, বিস্তৃত, উদার অসীম আকাশ।

সেই শূন্যতাকে দু-হাতে সাপটে ধরে সে যেন শিশুর মত বিচিত্রভাবে হেসে উঠল, অসীমের মাঝে সে একান্ত হয়ে গেল যেন নির্জনতার মধ্যে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাকের মত।

কোন ভিড় নেই, কোলাহল নেই, মানুষের সামান্যতম চিহ্ন নেই, এখানে শুধুই সে। নিশ্বাসের পর নিশ্বাসে বুকটা তার খালি হয়ে গেল। ঝড়ের পর এক মহাপ্রশান্তির শব্দহীন নিস্তব্ধতা। সেই শৈশবের কল্পনায় মনে হল, আকাশের অশরীরীরা এখানে এই ঘরেরই আনাচে কানাচে চলাফেরা করেন। আহা! জীবনটাকে যেন ফিরে পাওয়া গেল।

হেমন্তকাল। নারাণের কাজ শুরু হয়ে যায়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রথমে আরম্ভ হয় বেগুনের চারা বোনা, আর একদিকে ফুলকপির। আরো খানিক দীর্ঘ জায়গা তৈরী করে রাখল বাঁধাকপির জন্য। পশ্চিম ঘেঁসে দিল গাজরের বীজ ছড়িয়ে, ঘরের পাশে করল বিলিতী বেগুনের ক্ষেত।

কোনখান দিয়ে সময় কাটে, নারাণ যেন চোখের পলকে ঠাওর পায় না। সেই ভোর থেকে কাজ শুরু হয়। দেখতে দেখতে বেলা হয়। তখন সে রান্না করে। খেয়ে খানিকক্ষণ খাটিয়াটাতে শুয়ে মুখে গামছা চাপা দিয়ে থাকে। তারপরেই আবার কাজ। সন্ধ্যা নেমে আসে, তারই মাথার উপর দিয়ে নানান পাখীর দল বাড়ি ফিরে যায়। সে রেললাইনের ওপারের কল থেকে জল নিয়ে আসে, রান্না করে। তারপর কোন কোনদিন বসে থাকে তার ঝকঝকে উঠোনে খাটিয়া পেতে, নয় তো 'তালা-চাবি-কারিগরি' বা 'স্বাধীন ব্যবসা' নামের বই, অথবা কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ খুলে বসে। তারপর খেয়ে দেয়ে ঘুমোয়। মাসখানেক পরে কাজ একটু কমে এল তার। যা চাষ হয়েছে এখন তাকে বাঁচানোই সবচেয়ে বড় কাজ। পোকা মারা, আগাছা বাছা, জল নিকাশের পথটা একটু পরিষ্কার করা। জায়গাটাই সারের জমি, তবুও সে নানা রকম সার নিজে তৈরি করে।

এই অখণ্ড নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কোন কোন সময় সে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হেমন্তের আকাশে থেকে থেকে সাদা মেঘ কেমন করে আকৃতি বদলে ধীরে ধীরে উড়ে যায়, তাই দেখে তার সময় কেটে যায়। কখনো

শালিকের ঝগড়া ও ঝুটোপুটি খেলা দেখে হেসে ওঠে। পায়রার ঝাঁক উড়ে আসে, ধাপার মাঠের পোকার লোভে আসে বকের দল। কাঠবেড়ালি এলে তাড়া করে, ওরা কচি পাতা পেলেই সাবড়ে দেয়।

রোজ ভোরবেলা ওই পিটুলি গাছটায় অসংখ্য পাখীর কলকাকলীতে আগে তার ভারী বেজার লাগত। ভেবেছিল, ওটার ডালপালাগুলো কেটে দেবে, যাতে আর পাখী বসতে না পায়। পরে সে পাখীদের এ দাবিটা মেনে নিয়েছে।

সকালবেলার দিকে পশ্চিমের ময়লা-বিশুদ্ধির যন্ত্রটার ওদিকে কিছু কথাবার্তা শোনা যায়, কোন কোন সময় পূবের মাঠ থেকে ভেসে আসে হাঁকডাকের শব্দ, গোরু বাছুরের হাম্বা রব। তার ছোট ঘরটাকে কাঁপিয়ে এবেলা ওবেলা যায় অনেকগুলো রেলগাড়ি। তার এ জনহীন প্রান্তরে আগে এসব বিরক্তির কারণ হলেও এখন আর তার যেমন কোন কৌতূহল নেই, এসব কানেও তেমনি যায় না।

এর মধ্যে বার দু-তিনেক দীনদয়াল এসেছিল। কিন্তু নারাণ এমন ভাবে কোন কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকত যে, দীনদয়ালের বিস্ময়-বিরক্তির সীমা থাকত না। তবু কিছু বলত না, কারণ, সত্যি, একলা মানুষটা কি করে মাটির বুক এত সম্ভারে পরিপূর্ণ করে তুলেছে ভাবলেও অবাক লাগে। নারাণের মাথাটা খারাপ বলে সে ধরে নেয়। কিন্তু লোকটার আগমনে নারাণের বিরক্তি আরও বাড়ে।

প্রায় রোজই একটা হল্‌দে কুকুর কোত্থেকে সকালবেলা এসে তার গা শুঁকতে আরম্ভ করে, খেলার ভঙ্গি করে, ছুটে দাওয়ায় ওঠে! রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। মারলে ধরলেও আবার ঠিক আসে।

গৃহস্থের কোন পোষমানা প্রাণীও এখানে তার অসহ্য লাগে।

শুধু মনটা নয়, চেহারাটাও নারাণের কেমন বদলে গেছে। মুখটা যেন ভাবলেশহীন বোবার মত, সমস্ত নৈঃশব্দ্য যেন সেখানে এঁটে বসেছে। সে নিজে একটি কথাও বলে না, এমন কি একটু গুন্‌গুন্‌ও করে না। তবু এ মাঠ ও

আকাশের সঙ্গে যেন তার একটা নিয়ত বিচিত্র ধারার বিনিময় চলেছে, তার কোন শব্দ নেই।

কেবল ভর দুপুরবেলা যখন মাঠ ও আকাশ কেমন ঝিম মেরে থাকে, তখন ওই আকাশের বুক থেকে চিলের তীক্ষ্ণ চিঁ চিঁ আর্তস্বরে তার বুকের মধ্যে কেমন ধ্বক্ করে ওঠে। মনে হয় যেন কোন শিশু মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার করছে।

এমনি রাতেও যখন কোন পাখী বিলম্বিত সুরে ডেকে ওঠে, তার বুকের মধ্যে যেন দম আটকে আসে। মনে হয়, বুঝি কোন বউ কাঁদছে ক্ষুধা ও রোগের যন্ত্রণায়। তখন সে একটা নিশাচর প্রেতের মত সারা মাঠে প্রায় দাপাদাপি করে ফেরে। মাঠটা যেন তাকে গিলতে আসে।

এই সঙ্গেই কতগুলো ছবি পর পর তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার ফেলে আসা জীবন, তার পরিবেশ, সে জীবনের ঝড়ো বেগ, তার কলকোলাহল, তার কাজের উদ্দামতা। এক কথায় একটা বন্যার পাগলামি।

কিন্তু আবার তার মনটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সে নতুন করে সীম লাউয়ের মাচা বাঁধতে আরম্ভ করে, উত্তরের তে-কোণ জমিটাকে তৈরী করে মটর-শুঁটির জন্য।

হেমন্ত গিয়ে শীত এসে পড়ে।

পাতাল থেকে কচি শিশুর মুখের মত যেন একটু একটু করে ফুলকপি তার পাতার আড়াল মেলে দেয়। বড় বড় নধর বেগুন উঁকি দেয় বড় বড় পাতার আড়াল থেকে। অনুক্ষণ সতর্ক থাকতে হয় ইঁদুর আর বেজীর জন্য। সোনার মত গাজরগুলোর জন্য ওদের নোলা ছোঁক ছোঁক করে।

তারপর কাজের শেষে সেই আকাশের মুখোমুখি বসে থাকা, এই প্রকৃতিরই একজনের মত মিশে যাওয়া। একি জীবনের গা মেলে দেওয়া, শূন্যের মাঝে হারিয়ে যাওয়া বোঝা যায় না।

আরও একটা মাস কেটে গেল।

এমনি একদিন সকালবেলা বাঁধাকপির গোড়াগুলোতে সে মাটি তুলে দিচ্ছে! এমন সময় দেখল, ধাপা ও ধানক্ষেতের সীমানায়, যেখানটায় খাদ খুব সরু এবং

ঝোপঝাড়শূন্য খানিকটা ফাঁকা, সেখান দিয়ে একটা মেয়েমানুষ কোলে একটা বছর দু-তিনেকের বাচ্চা ও মাথায় একটা শাকের চুবড়ি নিয়ে লাফ দিয়ে তার সীমানায় এসে পড়ল। নারাণের মনে হল, লাফটা যেন তার বুকেই পড়েছে। অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ চোখে সে ব্যাপারটা দেখতে লাগল।

মেয়েমানুষটি নারাণকে দেখতেই পায়নি। সে তার কালো শক্ত পুষ্ট শরীরে দৃঢ় পদক্ষেপে, ডাগর ডাগর চোখে কিছুটা বিস্ময় কিছুটা কৌতূহল ও সংকোচ নিয়ে সোজা নারাণের উঠোনে গিয়ে প্রথমে ছেলেটাকে নামাল, তারপরে শাকের চুবড়িটা। সেয়ানা বয়স, কপালে সিঁদুর নেই। সে কয়েকবার উঁকি ঝুঁকি দিল, ভ্রূ টেনে আপন মনে বুঝি একটু হাসল, তারপর এই মাঠের সমস্ত নৈঃশব্দ্যকে যেন মুহূর্তে ঝংকৃত করে তার সরু মিষ্টি গলায় ডেকে উঠল, 'কই গো, কেউ নেই নাকি?'

সে শব্দে যেন মাঠটা হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠল।

নারাণ তো ক্ষেপে বারুদ! দীনদয়ালই যেখানে পাত্তা পায় না সেখানে কিনা একটা মেয়েমানুষ, একেবারে বাচ্চা নিয়ে! সে রাগে খ্যাঁক খ্যাঁক করতে করতে একেবারে হামলে পড়ল এসে, 'কেন, কেন? কাউকে দিয়ে তোমার কি দরকার?'

খ্যাঁকানি শুনে বাচ্চাটা চমকে মাকে জাপটে ধরল। মেয়েটিও একেবারে ভড়কে গিয়ে প্রায় ডুকরে উঠল, 'ওমা! এ কেমন মিন্‌সে গো বাবা!'

নারাণও যেন স্বপ্নের ঘোরে এক যুগ পরে নিজের গলার স্বরে চমকে গেল। তবুও খিঁচিয়ে উঠল, 'যেমন হই। তোমার দরকারটা কি?'

কিন্তু সেই ডাগর চোখে ও মিঠে গলায় ভয় ফুটল না যেন তেমন। বলল, 'দরকার আবার কি, বাজারে যাব এট্টু শাক মাক বেচতে, এখান দিয়ে অল্পে হুস্ করে যাওয়া যায়, তাই।'

কর্কশ গলায় ভেংচে উঠল নারাণ, 'আর হুস্ করে যায় না, ওই ঘুর পথেই এট্টু ঠায়ে যেও।'

মেয়েটি ভ্রূ তুলে বাঁকা চোখে এক মুহূর্ত নারাণকে দেখে, এক হ্যাঁচকায়

চুবড়িটা মাথায় তুলে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'এঘরে একদিন আমিই ছিলুম, ছিলুম আমার সোয়ামীর সঙ্গে। তার আবার অত কথা কি। মানুষটা মল, তাই, নইলে···'

মনে হল ওর গলার স্বরটা ভেঙে আসছে। 'এখন শাক ঢেরো বেচে খাই···'

'থাক'। চেঁচিয়ে উঠল নারাণ, 'এখন পথ দেখ। শালা ঝুট ঝামেলা······।'

মেয়েটি আর একবার তার ভেজা চোখে নারাণের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে ছেলে কোলে নিয়ে ফর্‌ফর্ করে চলে গেল পশ্চিমে।

নারাণের গায়ে যেন বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে ওই আপদটা, এমনি করে গা ঝাড়তে লাগল সে। মনে হল তার সমস্ত মাঠটা যেন লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে একেবারে এমনি ভাবে সে ঘুরে ঘুরে তার বেগুন কপি দেখতে থাকে। দীর্ঘ দিন পরে তার নিঝুম শান্তিকে ছরকুটে দিয়ে গেল মেয়েমানুষটা।

কিন্তু একটু পরেই আবার তার সে প্রশান্তি নেমে এল, নিস্তরঙ্গ হয়ে এল সমস্ত কিছু। দিনের শেষে সন্ধ্যা আকাশ নেমে এল হাতের কাছে। আর মৌন সন্ধ্যায় রোজকার সেই বিট্‌লে পাখাটা ডিগ্‌বাজি খেয়ে ডেকে হেঁকে চলে গেল। ঝরে ঝরে পড়ল পিটুলির পাতা।

আশ্চর্য। পরদিনও সকালে মেয়েটা এল এবং পূব প্রান্তে সীমের মাচার কাছেই একেবারে নারাণের মুখোমুখি দেখা।

আর যায় কোথায়। নারাণ খ্যাঁক্ করে উঠল, 'ফের?'

মেয়েটার চোখে প্রায় হাসিই ফোটে বুঝি। বলে, 'এই মরেছে। তা চটো কেন?'

নারাণ আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'চটি কেন?'

ছেলেটা মায়ের কোলে কুঁকড়ে যায়। মেয়েটাও হাঁপায়। পথের আলে শিশিরে ভেজা পা দুখানি ধুয়ে গিয়েছে। মুখ চোখও যেন ভেজা ভেজা। গায়ে জামা নেই, শাড়ীটাই জড়ানো। তাতেই যেটুকু শীত মানে। গলায় আবার একটা পেতলের হার। বলে, 'তা অতটা ঘুরে যাওয়ার চেয়ে—'

'সবাই যায়।' ধমকে ওঠে নারাণ।

'তা বলে আমিও যাব?' ভ্রূ তুলে কথাটা বলেই ছেলেকে নামিয়ে, মাথার বোঝাটা নামায়। কোমরে হাত দিয়ে বলে, 'বাব্বা! কম পথ? কোমর যেন ধরে যায়। পথে এট্টু জিরনোও হয়। আর···এলে পরে এখানটায় না এলে মনটা কেমন করে।'

নারাণের বুকের মধ্যে কেমন ধ্বক্ ধ্বক্ করে। যেমন চিলের ডাকে করে ওঠে। কার কথা যেন তার বারবারই মনে আসতে থাকে আর রাগে বিরক্তিতে তার মেজাজ চড়ে যায়।

মেয়েটা বলেই চলে, 'তা-পরে জানো, মিন্‌সেটা ভারী বোকা ছেল। পশ্চিমে দিলে উনুনের জায়গা করে। তা সে বোশেখী রাত ঝড় জল মানবে কেন? আবার আমি উত্তুরে উনুন পাতি, তবে না তুমি ওখানে খুন্তি নাড়তে পার। তা তোমার বুঝি বউ টউ—'

'দুত্তেরি তোর বউয়ের নিকুচি করেছে।' রাগে চিৎকার করে ওঠে নারাণ, 'তুমি ভাগবে কি না। শালা যত আপদ এসে জুটবে এখানে।'

অমনি মেয়েটার চোখেমুখেও রাগ ফুটে ওঠে। বলে, 'অমন মান্‌সের মুখ দেখতে নেই।'

বলে ছেলে চুপড়ি নিয়ে ফরফর করে চলে যায়। খানিকটা গিয়ে কুঁদুলে মেয়েমানুষের মত ঘাড় বেঁকিয়ে চেঁচিয়ে বলে গেল, 'আমি রোজ যাব, দেখি কি কর তুমি।'

নারাণের ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে ঠেঙিয়ে দেয়। কিন্তু যায় না।

সকালের ছড়ানো সোনার রোদ যেন কালো হয়ে ওঠে, মেয়েটার গোমড়া মুখের মত মাঠটার সমস্ত নীরবতা ও সৌন্দর্য যেন কোথায় উবে যায়। আজ এ মাঠের সঙ্গে মনটাকেও তার লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গিয়েছে, এমনিভাবে সে অনেকক্ষণ ছটফট করে ঘোরে। শহরের সেই ঘুপ্‌চি ঘরটায় একপাল ছেলেমেয়ে আর একটি বউয়ের কথা বারবারই তার মনে আসে আর বলে, 'ভ্যালা আপদ এসে

জুটেছে। টকের জ্বালায় পালিয়ে এলুম, তেঁতুল তলায় বাস! শালার দুনিয়ায় কি কোথাও শান্তি নেই?'

কিন্তু একটু পরেই আবার তার শান্তি নেমে আসে। সীমাহীন নৈঃশব্দের মাঝে আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিজেকে ছড়িয়ে দেয় সারা মাঠে। দাঁড়ায় আকাশের মুখোমুখি, চুপচাপ রাঁধে, খায়। পিটুলির ঝরা পাতাগুলো তুলে রাখে। গাছটা ন্যাড়া হয়ে যাচ্ছে।

পূবের দিগন্তবিস্তৃত মাঠটা ফাঁকা, ধান কাটা হয়ে গিয়েছে। সেখানে আর কাউকে দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে ফুলকপি আর বেগুন অনেক নিয়ে গিয়েছে দীনদয়ালের লোক। নারাণ যেন কোলের শিশুকে দেওয়ার মত করে সেগুলো দিয়েছে। আবার সেখানে ভরে দিয়েছে নটে পালং ছড়িয়ে।

এ মাঠের কোথাও শস্যহীন শূন্য থাকবে এটা যেন সে ভাবতেই পারে না। শরতের শুঁয়ো পোকারা রুদ্ধশ্বাস বেদনার ভেতর দিয়ে আদায় করেছে নবজন্ম। নতুন পালকে তারা প্রজাপতি হয়ে ভিড় করেছে সীম লাউয়ের মাচায়।

মৌন রাতের তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে নারাণ, সে ফুলের বাগান করবে এখানে। অজস্র সাদা আর লাল ফুল। তারপর তার ঘুমন্ত চোখের পাতায় কারা এসে যেন নাচানাচি করে। কয়েকটি শিশু, একটি সলজ্জ হাসি মুখ, ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বিয়ে, কারখানা, বস্তি, মৃত্যু আর শ্মশানের চিতার লেলিহান শিখা।

পরদিন সকালবেলা মেয়েটি আবার এল, এবং রোজই আসতে থাকে। আর রোজই চলে সেই চেঁচামেচি, খেঁচাখেচি। যত না খিঁচোয় নারাণ, তত জবাব দেয় মেয়েটা।

মেয়েটি এ ধাপার মাঠে কিছুতেই তার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না। আর নারাণের পক্ষে এ ঝামেলা প্রাণান্তকর।

কিন্তু মেয়েটির এখন ভাব দেখে মনে হয়, নারাণের তর্জন গর্জনকে সে যেন তেমন আমলই দিতে চায় না। শুনুক বা নাই শুনুক, সে নিত্য নতুন প্রসঙ্গ

পেড়ে বসে। কোনদিন বলে, 'তা-পরে জানো, একে বর্ষার রাত, তায় ধাপা, মিন্‌সে আর রাতে ফিরল না। আমি তো ব্যথার উল্‌টি পাল্‌টি খাচ্ছি। ভোর রাতে বিয়োলুম এ ছেলে। তাই না এর নাম রেখেছি ধাপা। ও যে ধাপার ছেলে।'

কোনদিন বা কুকুরটাকে দেখিয়ে বলে, 'গাঁয়ের থেকে নিয়ে এসেছিল মিন্‌সে, এই এতটুকুন। নাম ওর রাঙি।' আর কুকুরটারও আজকাল আসা বেড়ে গিয়েছে। ধাপা আর তার মায়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে খেলা করে। মেয়েটি সারা মাঠে চোখ বুলোয় আর বলে, 'তা বাপু সত্যি, তুমি একটা মিন্‌সে বটে। একলাই যা ফলিয়েছ, চারজনে তা পারে না।'

তারপর একটু বা উৎকণ্ঠাভরেই বলে, 'এ তোমার কি ভুতুড়ে বাই বাপু, ঠাণ্ডার মধ্যে খালি গায়ে কাজ কর? একটা কিছু জড়িয়ে নিতে পার না?'

ধাপার ভয়টাও আজকাল কমে গিয়েছে। সে বেমালুম টলতে টলতে গিয়ে কখনো নারাণের ঘরে ঢুকে পড়ে, কিংবা বড় বড় রক্তহীরের মত বিলাতী বেগুনগুলো ছিঁড়তে যায়।

অমনি নারাণ তেড়ে গিয়ে শক্ত হাতে ছেলেটাকে আছাড় দিতে গিয়েও না দিয়ে ওর মায়ের কোলের কাছে বসিয়ে দিয়ে যায়, আর গালাগাল দিতে থাকে।

তাই দেখে মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে। সে হাসিতে এ নির্জন প্রান্তর যেন শিউরে ওঠে আচমকা। ফিরতি পথেও এখানে হয়ে যায়। আপন মনেই বলে, 'সেই কখন বেরিয়েছি! দুকুরে দুটো মুড়ি খেয়েছি, এখন গিয়ে রাঁধব, তবে খাব। মোড়লের বাড়িতে ধান ভানা থাকলে তো কথাই নেই। সেই রাত দু-পহরে খাওয়া।'

তারপর পিটুলি তলায় শুকনো পাতার উপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে এলো চুল আঁট করে বাঁধে। ঘুমন্ত ধাপাকে হয়তো মাটিতেই শুইয়ে দেয়। তখন যেন তারও নীরব হাওয়ার পালা আসে। নারাণের বিরক্তি-রাগকে তুচ্ছ করে হঠাৎ মিহি ভরাট গলায় বলে ওঠে, 'আর পারিনে এ জীবনের ভার বইতে। মনে হয় এখেনে···অমনি করে সারাটা রাত কাটিয়ে দিই। এই এখেনে···।'

তারপর হঠাৎ নারাণের কাছে ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'তা বাপু

বলে রাখি, এ ধাপার ব্যামো বড় বিদ্‌ঘুটে। কেমন হাত পায়ের শির টেনে, বেঁকে তুমড়ে মানুষ মরে যায়।' এক মুহূর্ত যেন সে মৃত্যুকে দেখে হুতোশে বলে ওঠে, 'এট্টো সাবধানে থেকো বাপু!'

নারাণের মনে হয় কে যেন তার শ্বাসনলিটা চেপে ধরেছে। মেয়েটির গরম নিশ্বাস আর বিচিত্র ছবি ও কথার গোলমালে তার মাথাটা ঘুরে ওঠে।

সে হঠাৎ আচমকা তেপান্তর কাঁপিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'যাও যাও···যাও এখান থেকে।'

ধাপার মা চমকে ওঠে, বলে, "আ মলো! এটা কে রে!'···বলে তাড়াতাড়ি ধানকাটা মাঠের ওপর দিয়ে চলে যায়।

উত্তরের হিমেল চাপ ঠেলে হুস্ করে বা একটু দক্ষিণে হাওয়া আসে। পিটুলির পাতা উড়িয়ে, লাউ সীমের মাচা সরসরিয়ে, নটে পালংএর মাথা দুলিয়ে দিয়ে যায়।

তালা কারিগরী আর স্বাধীন ব্যবসার বই খোলাই থাকে কোলের উপর। প্রদীপের শিখা পুড়তেই থাকে। অসীম রাত্রি আর মহাকাশ, মাঠ আর ঘর সব একাকার হয়ে যায়। সংসার নিশ্চল, নিঃশব্দ। এই ভালো, এই শান্তি।

তবু, ধাপার মা-ই বল, আর মেয়েই বল, সে রোজই যায় আর আসে। সেও যেন ওই দক্ষিণ হাওয়ার মত একটু একটু করে উত্তরে চাপ ঠেলে আসছে। রোজ যেন একটা নতুন উপসর্গের মত।

হয়তো ঠাট্টা করে বলেই ফেলে, 'আজকের রাতটা থেকেই যাব।' কিংবা 'তা-পরে জানো, তোমাকে এ ধাপায় দেখে আমার ভারী ভালো লাগে। তবে মানুষটা তুমি ঠিক নও।'

পুঁটকে ধাপাটাও কখন নিঃসাড়ে এসে কৌতূহল বশতঃ নারাণের পায়ের লোম ধরে টান দেয়।

নারাণ দাঁত খিঁচিয়ে ভাবল, শালা তেল দেও, সিঁদুর দেও, ভবি ভোলবার নয়। আচ্ছা! রাত করেই সে খাদটা যেখানে খুবই সরু, সেখানে হাত পাঁচেক লম্বা একটা খুঁটির বেড়া খাড়া করে দিল। তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমোল।

পরদিন মেয়েটি এসে বেড়া দেখে অবাক হয়ে গেল। যেন বিশ্বাসই করতে পারেনি, এমনি ভাবে বড় বড় চোখে মাঠের চারদিকে নারাণকে খুঁজতে লাগল।

নারাণ লাউ মাচাটার পেছনেই কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিল কিছু ধনে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। জেনেও সে ফিরে দেখল না।

মেয়েটি বারকয়েক ডেকে ডেকে চেষ্টা করল ছেলেটাকে বেড়া টপকে এপাশে দিতে। না পেরে আপন মনেই হেসে ফেলল। আবার খানিকটা ডাকাডাকি করেও যখন কিছু ফল হল না, তখন নারাণকে যা-তা বলে গালাগালি দিতে লাগল।

নারাণ লাউ পাতার আড়াল থেকে দেখল, জলভরা দুই ডাগর চোখে মেয়েটা এদিকেই দেখছে কটমট করে, আর বলছে, 'ধাপার ভূত কম্‌নেকার, ওকে যেন চেরকাল মাঠে মুখ দিয়েই পড়ে থাকতে হয়।'

তারপর ছেলে চুবড়ি নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে হন্ হন্ করে চলে গেল ধান কাটা মাঠের উপর দিয়ে।

নারাণের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে ওদের চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর নিজেরই নিশ্বাসে চমকে উঠে নারাণ দেখল বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে, ধান কাটা মাঠটা ফাঁকা।

যাক্! যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে নিজের কাজে মন দিল। সেই একই কাজ, একই রকম। কেবল নৈঃশব্দ্য যেন আরও ভারী হয়ে এল।

পরদিন নারাণ কাজে হাত দিতে যায় আর চমকে চমকে ওঠে কেবলি। চোখ দুটো বার বার গিয়ে পড়ে ওই বেড়ার গায়ে। ধেনো মাঠটা দুলে ওঠে চোখের সামনে।

তাকিয়ে দেখে বেলা কোনখান্ দিয়ে চলে যাচ্ছে, অথচ কাজ কিছুই হয়নি।

হঠাৎ হাওয়া আসে হু হু করে। পিটুলি গাছটায় আর একটাও পাতা নেই। রুক্ষ, রিক্ত।

মাঠটাও কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছে। দীনদয়ালের লোক এসে রোজই শাক তরকারি সীম লাউ নিয়ে যায় বাজারে। এই নিয়ম—যত ফলন, তত বিক্রি।

রাত্রি আর আকাশ যেন বড় তাড়াতাড়ি নেমে এসে সব কিছু গ্রাস করে ফেলে। কেবল বোবা রাত্রির চোখে ঘুম নেই।

পরদিনও অকাজের মাঝেই কেটে যায়। মরশুম শেষ। মাঠ খালি হয়ে আসছে। কেবল অসহ্য যন্ত্রণাভরা একটা পরীক্ষার মধ্যে প্রাণটা দুমড়ে যেতে থাকে। ওই বেড়াটা যেন মাথার মধ্যে খাঁচার মত ঘুরতে লাগল।

সন্ধ্যাবেলা নারাণ নিঃসাড়ে গিয়ে বেড়াটাকে কেটে ভেঙে খুলে ফেলে দিল। দিয়ে তাড়াতাড়ি এসে আবার শুয়ে পড়ল। যেন লুকিয়ে চুরিয়ে সে একটা বন্দীশালার দরজা ভেঙে দিয়ে এসেছে। এসে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

পরদিন পলে পলে বেলা গেল। খাদের ধারে বেড়াহীন কুল খেজুরের ফাঁকা জায়গাটা যেন খাঁ খাঁ করতে লাগল। নিঃশব্দ, শূন্য। কেবল কুল খেজুরের মাথা দুলল হাওয়ায়।

নারাণের চোখ দুটো টন টন করে উঠল। তবু কেউ এল না সেখানে চোখ জুড়োতে।

তেপান্তরের রাত্রি যেন দু হাতে জাপটে ধরল নারাণকে। অসহ্য ছটফটানিতে একটা বোবা পশুর মত অন্ধকারে মাঠ আর ঘর করে বেড়াল।

তার পরদিন দূর আকাশে লেপটানো চিমনির দিকে তাকিয়ে সে স্থির করে ফেলল, শহরে যাবে। শহরে···তার বন্ধু আর পড়শীদের কাছে।

তাড়াতাড়ি একটা চুবড়ি নিয়ে অবশিষ্ট কয়েকটা ফুলকপি থেকে একটা তুলে নিল। একটা বাঁধাকপি, কয়েক সের বেগুন, মটরশুটি, কিছু সীম, একটা কচি লাউ, কিছু নটে পালং।

তারপর স্নান করে, কাপড় পরে, ধোয়া জামাটি গায়ে দিয়ে, মাথায় গামছা জড়িয়ে ঘরে শিকল তুলে দিল। তরকারির চুবড়িটা মাথায় নিয়ে উঠোনে এক মুহূর্তে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে একেবারে পূবের খাদের মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু শহর যে পশ্চিমে! তা হোক।

ধাপার মা যেমন করে লাফ দিয়ে এপারে পড়ত, তেমনি করে মাথায় বোঝা নিয়ে নারাণ ওপারে লাফ দিয়ে পড়েই একেবারে সিঁটিয়ে গেল। মনে হল, কে যেন হেসে উঠল তার পিছনে। সন্তর্পণে চোখ ঘুরিয়ে এদিকে ওদিকে দেখল কেউ নেই।

দেখে হন্ হন্ করে ধান কাটা মাঠের উপর দিয়ে চলল দূরের ওই গাঁয়ের রেখাটার দিকে। গাঁয়ে যখন পৌছুল, তখন অনেক বেলা। ভাবল, কি করে যেত এত পথ? কিন্তু কোথায় বা তার ঘর, গাঁয়ের কোন সীমানায়। অনেক ঘোরাঘুরির পর এক কিষাণ দেখিয়ে দিল, গাঁয়ের বাইরে মাঠের ধারে ধাপার মায়ের ঘর। নারাণ দেখল, ঘর তো নয়। উঁচু ভিটেয় একটা বিচুলির ছাউনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। উঠোনের খুঁটোয় একটা রোগা ছাগল বাঁধা। কটা পায়রা যেন কি খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। আর ধাপা কালো ন্যাংটা ছেলেটা পায়রাগুলোর সঙ্গে আবোল তাবোল বকছে।

কিন্তু নারাণকে দেখেই তার চক্ষু চড়কগাছ। সে একেবারে টলতে টলতে হেই মা হেই মা করতে করতে ঘরে ঢুকে কি একটা কথা বার বার বলতে লাগল।

তার মায়ের ভারী গলা শোনা গেল, 'কে-রে?'

নারাণ একেবারে দরজার কাছে এসে মাথার চুবড়িটা নামিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করল। মেয়েটার দিকে একবার চোখ পড়তেই বলে ফেলল, 'এলুম।'

ধাপার মা কাঁথা ঢাকা দিয়ে শুয়েছিল। এক মুহূর্ত নারাণের মুখের দিকে দেখে ঝাঁজ দিয়ে বলল, 'আদিখ্যেতা! কে বা আসতে বলেছে!'

নারাণ চুবড়ি হাতায়, মাটি খোঁটে। খালি বলে, 'এসে পড়লাম।'

কি বলতে গিয়ে আটকে গেল ধাপার মার গলায়। তাড়াতাড়ি মুখটা ঢেকে ফেলে কাঁথার তলায়। কেবল কাঁথার সঙ্গে যেন শরীরটাও ফুলে ফুলে ওঠে।

অনেকখানি সময় চলে যায়। ধাপা হাঁ করে বসে বসে দুজনকে দেখে।

হঠাৎ নারাণ জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে?'

জবাব আসে চাপা গলায়, 'জ্বর।'

'তা হলে—'

'থাক।' বাধা দেয় ধাপার মা। বলে, 'ওসব বারোমেসে, সেরে যায় আবার।'

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ।

থেকে থেকে খাপ্‌চি কেটে কেটে নারাণ বলে, 'এই······এট্টু সব্‌জি। ধাপা খাবে। তা—তুমি······আর তো তুমি যাও টাও না······'

'থাক', রুদ্ধ গলায় কথাটা বলে মুখের ঢাকনাটা খুলতেই দেখা যায়, মেয়েটার ডাগর ডাগর জলভরা চোখ দুটো কান্নায় লাল হয়ে উঠেছে। বলে কান্নাভরা গলায়, 'কেন······কেন? এমন শেয়াল কুকুরের মত তাড়ানোই বা কেন, আবার······'

বলতে পারে না আর।

নারাণ বলল, তেমনি থেমে থেমে, 'পারলুম না থাকতে।···চলে এলুম।'

তেমনি ফুঁপিয়ে বলে মেয়েটি, 'কেন—কেন এ আদিখ্যেতা?'

নারাণের ঠোঁট নড়ে, থুতনিটা কাঁপে। হঠাৎ ধাপাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মোটা গলায় বলে ওঠে, 'ফাঁকা মাঠ······আর কেউ নেই! লোক নেই······জন নেই······সাড়া শব্দ নেই···শুধু······শুধু······'

থেমে গিয়ে আবার বলে, 'কাঁহাতক্ পারা যায়···বল?'

মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে ফিস্ ফিস্ করতে থাকে, 'কে বলেছে পারতে,······কে বলেছে?'

নারাণ তবুও বলতে থাকে, 'আমি···আমি যেন পালিয়ে আছি।···হ্যাঁ···শুধু মাঠ···ফাঁকা।'

বলতে বলতে একটা নিঃশব্দ অসহ্য গুমোট যন্ত্রণাকে ভেঙে চুরে, একটা লেদ মেশিনের বিরাট পালিশ-করা চাকা যেন বন্ বন্ করে তার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। যন্ত্রের ঘর্ ঘর্ শব্দ যেন চাপা পড়া প্রাণের অসীম নৈঃশব্দ্য ও বোবা নিস্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে হেসে উঠল। একটা বিচিত্র ঝোড়ো বেগ, লোকজন গাড়ী ঘোড়া ধূলো ধোঁয়া, হাসি গান কান্না হল্লা তার লুকানো

প্রাণটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। সেখানে জীবনের ঝড়। বন্ধু, বস্তি, মহল্লা অষ্টপ্রহর কেবলি বাঁচতে চাওয়া।

নারাণ আপন মনেই বড় বড় চোখে ফিস্ ফিস্ করে উঠল, 'যাব, চলে যাব সেখানে।'

ধাপার মা গালে হাত দিয়ে বলল, 'কোথা ?'

'শহরে……কাজে।' বলে ধাপার মুখটা তুলে বলে, 'যাবি তো রে ধাপা ?'

ধাপা জবাব দিল, 'মার চঙ্গে।'

ধাপার মা মুখ টিপে বলল, 'মরণ !'

বলে চুবড়িটা টেনে নিল কোলের কাছে। বিচুলির ছাউনিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাওয়া।

এস্‌মাল্‌গার

রাত পুইয়ে এল। তবু খানিক দেরী আছে। সময়ের মাপে নয়। আকাশের মুখ কালো। আশ্বিনের শেষ। হেমন্ত আসছে। তবুও আকাশে বর্ষার মেঘবতীর গোমড়া মুখের ছায়া।

এ সময়ে কলকাতা থেকে কিছুদূর উত্তরে মাঠের মাঝে রেল স্টেশনটা যেন একটা বোবা বদ্ধভূমি। স্তিমিত কয়েকটা আলো যেন অতন্দ্র প্রহরীর মত নিষ্পলক চোখে কিসের প্রতীক্ষা করছে। প্ল্যাটফরম, টিনের ছাউনি, দরজা-বন্ধ আপিস, খোঁচা লোহার বেড়া আর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া মাঠ, জলা, সব বোবা, তবু জীবন্ত। নিশ্চল, তবু অনুভূতিময়।

থেকে থেকে আসছে একটা পূবে হাওয়ার ঝোড়ো ঝাপটা। পূর্ব আকাশে সামান্য আলোর ইশারা। সে আলোয় মেঘ দেখাচ্ছে যেন ছড়ানো লটবহর।

ঘটাং করে একটা শব্দ এল দূর থেকে। সিগন্যালের খবরদারী লাল চোখ বুঁজে গেল, ভেসে উঠল নীল চোখের আমন্ত্রণ। আসছে। ভীত পাখী কিচির মিচির করে উঠল সিগন্যালের মাথার বাসা থেকে। আবার চুপচাপ।

দু-একজন করে লোক আসছে স্টেশনে। ধীরে নিঃশব্দে। বড় বড় ছায়া ফেলে, গা হাত পা এলিয়ে। স্টেশনের বাইরে আচমকা কালো আঁধার থেকে যেন হঠাৎ প্রতীক্ষারত আততায়ীর দল বেরিয়ে আসছে। আসছে।

তারপর বোঝা গেল সেই চির পরিচিত কাশি। ঘুংরি কাশি। কাশি নয়, যেন কামারের নেহাই-এর বুকে হাতুড়ির ঘা। তীব্র শ্বাসরোধী, একটানা। কাশি শুনে বোঝা যায় না লোকটার বয়স, বোঝা যায় না মেয়ে না পুরুষ।

স্টেশনের পূর্বদিকের অন্ধকার মাঠ থেকে কাশিটা ধেয়ে এল প্ল্যাটফরমের

দিকে। সেই সঙ্গে কাশির প্রতি ক্ষমাহীন অস্ফুট কটূক্তি, 'শালার কাশির আমি ইয়ে করি।'

গাড়ি এসে পড়ল। তার কপালের তীব্র আলোয় দেখা গেল দুটো ভেজা লাল চোখ, শুকনো মোটা ঠোঁটের ফাঁকে লাল্‌চে ছোট ছোট দাঁত, কোঁচকানো মুখ, তামাটে রং, চট ফেঁসোর মত চুল, চটের বস্তা কাঁধে, গায়ে বুক-খোলা একটা তালি মারা হাঁটু পর্যন্ত হাফসার্ট, তার তলায় প্যাণ্ট বা কাপড় কিছু আছে কিনা বোঝবার যো নেই। তার তলা থেকে নেমে এসেছে দুটো কঞ্চির মত পা আর পায়ের পাতা যেন পাতি হাঁসের চ্যাটালো পা। থ্যাবড়া, মোটা ফাঁক ফাঁক আঙুল। লম্বায় আড়াই হাত। সমস্তটা মিলিয়ে এমন একটা তীক্ষ্ণতা, যেন তলোয়ার নয়, বেখাপ্পা খাপে ঢাকা একটা শানিত গুপ্তি।

বয়স বিশ কি পঞ্চাশ কি বারো, বোঝার উপায় নেই।

তবে আসল বয়স তেরো। নাম গৌরাঙ্গ। অর্থাৎ গোরা।

তবে যদি জিজ্ঞেস কর, 'তোর নাম কি র‍্যা?'

শুনবে দোআঁসলা স্বরের জবাব, 'গোরাচাঁদ এস্‌মাল্‌গার।'

এস্‌মালগার অর্থে স্মাগ্‌লার। কিসের স্মাগ্‌ল? অমনি শুনবে যাত্রার সুরে,

চাল চুলো নেই বেচালেরে
আমি যোগাই চাল।

দেখা যাবে, গাড়ির কামরার মধ্যে সে গানের দোয়ার আছে গণ্ডা কয়েক। তারাও গেয়ে উঠবে। সবাই এস্‌মাল্‌গার।

আশি মাইলের মধ্যে যে ক-টা জংসন স্টেশন আছে, সবগুলোর পুলিস রিপোর্টের খাতায় একটু নজর করলেই দেখা যাবে নাম, গৌরাঙ্গচন্দ্র দাশ, বয়স তেরো, অপরাধ বে-আইনী চাল বহন (পনের সের), কোর্টে প্রডিউসের অযোগ্য। অতএব···।

গোরাচাঁদ তিনবার জেল খেটেছে। একবার পুরো একমাস, একবার পঁচিশ দিন আর আঠারো দিন একবার। জেলে ছোকরা ফাইলে থেকে জীবনের

নোংরামি ও সর্বনাশের এক ধরনের শেষ তলা অবধি সে দেখেছে। বুঝেছে কিছু কম। তবে নেশা তার জীবনের যেটা ধরেছে সেটা সর্বনাশের।

একবার ট্রেনের মধ্যে শুনল, সামনের স্টেশনে পুলিস রয়েছে চাল ধরার জন্য। গাড়ি স্টেশনে ঢোকবার আগেই গোরা প্রথমে ফেলে দিল তার পনের সেরের ব্যাগ, তারপর লাফ দিয়ে পড়ল নিজে।

একমাস পরে যখন হাঁসপাতাল থেকে এল তখন তার গায়ে মাথায় অনেকগুলো ক্ষতের দাগ আর সামনের মাড়ির একটা দাঁতের অর্ধেক নেই, বাকীটা নীল হয়ে গিয়েছে। ফলে, তার পাকা পাকা মুখে যেটুকু ছিল ছেলেমানুষির অবশিষ্ট, তা হল এক মহা ফেরেববাজের হাসি।

তার পঞ্চান্ন বছরের বুড়ো এস্মাল্গার বন্ধু রসিকতা করে বলল, 'বাবা গোরাচাঁদ, তোমার সেই চালগুলান এ্যাদ্দিনে গাছ হয়ে আবার ধান ফলেছে।'

অর্থাৎ যে চাল নিয়ে সে লাফিয়ে পড়েছিল। যেমনি বলা, তেমনি দেখা গেল এক রাশ বাদামের খোসা ও ধুলো বুড়োর মুখ চোখ ঢেকে দিয়েছে। সুতরাং গালাগাল আর অভিশাপ। কিন্তু এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে গোরাচাঁদ মাথা ঘামায় না।

গাড়ি এল। গোরা তখন দম নিচ্ছে কাশির দমকের। স্টেশনের কুলিটা বিরক্তি ভরে এমন করে এসে ঘণ্টা বাজাল, যেন কোন রকমে কর্তব্য সারা গোছের পাড়ার নেড়ি কুকুরটার খিঁচোনি। গাড়ি যখন ছাড়ল তখন গোরা তার পছন্দসই কামরা খুঁজতে লাগল।

গাড়ির গতি বাড়ল তবু কামরা আর পছন্দ হয় না। সেই মুহূর্তে একটা কামরা থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ্যাই শালা গোরা!'

চকিতে কি ঘটে গেল। দেখা গেল, গোরা সেই কামরার হাতলে বাদুড়ের মত ঝুলছে আর তার বন্ধুরা চিৎকার জুড়েছে তাকে পেয়ে।

ব্যাপারটা বিপজ্জনক, কিন্তু ওটা অভ্যাস। একদিন ছিল, ক্রু আর পুলিসের ফাঁদে পড়ার ভয়ে দেখে শুনে নিতেই গাড়ি ছেড়ে দিত, দৌড়ে উঠতে হত। এখন তো দুটো চোখ নয়, চোখ চারটে এবং সচকিত। তবু ধীরে সুস্থে থামানো গাড়িতে উঠবে, মনের এতখানি সুষ্ঠুপনা ভাবাই মুশকিল।

এর মধ্যে টিকেট কাটার কথা কল্পনা করাই যায় না। মূলধন তো পনের সের চাল। এ পনের সের আর কোনদিন আধমণে পৌঁছল না। অর্থাৎ ষাট মাইল দূর থেকে পনের সের চাল আনলে, প্রতি সেরে কোন দিন দু-আনা, দশ পয়সা, কখনো বা মেরে কেটে তিন আনা তার থাকে। সারা দিনে খাবার বরাদ্দ চার আনা থেকে পাঁচ আনা। বাকীটা বাড়িতে দিতে হয়। সেখানে আছে ছোট ছোট পাঁচটা ভাই বোন, আর একটি তার মায়ের পেটে বাড়ছে। বাপ না থাকার মধ্যে। অন্তত গোরার কাছে। সে লোকটি এককালে ছিল নিম্নবিত্তের ভদ্রলোক। আশা ছিল বিত্তবান হওয়ার। এখন কলকাতার বাইরে রেফিউইজি ক্যাম্পে বসে সে আশা তো কবেই উধাও হয়েছে। উপরন্তু সে এখন গোরাচাঁদের রোজগারে নির্ভরশীল একজন অবাঞ্ছিত রুগ্ন ভার মাত্র।

সুতরাং এ যুগের বাঙালীরা বাঙালী গোরাকে চেনে না। দু-বছর আগে ওদের এলাকার রেশন ইনস্পেক্টর এসে যখন গোরার মাকে জিজ্ঞেস করলে, 'হেড্ অব্ দি ফ্যামিলি কে,' তখন ইঞ্জিরি কথা শুনে গোরার মা হাঁ করে তাকিয়েছিল। ইনস্পেক্টর ব্যাপারটা বুঝে বললে, 'তোমাদের সংসারের কর্তা কে?' তখন গোরার মা গোরার হাত ধরে এনে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ইন্স্পেক্টর তো থ।

এর উপরে ষাট মাইলের ভাড়া দুটো টাকা যদি গোরা খরচই করতে পারবে তবে আর এস্মাল্গার হওয়ার কি দরকার ছিল।

এর পরে গাড়ির মধ্যে সে এক তুমুল কাণ্ড! মস্ত লম্বা কামরাটার মধ্যে আর কোন যাত্রীকে চোখে পড়ে না কেবল গোরা আর তার সমবয়সী সঙ্গীদের ছাড়া। তারা সকলেই গোরার সহগামী ও সহধর্মী, সকলের প্রায় একই ছাঁচ, একই গড়ন। তবে নেতা হিসাবে তারা যে-কোন কারণেই হোক, গোরাকেই মেনে নিয়েছে।

সমস্ত গাড়িটার মধ্যে তারা এক কোণে দলা পাকিয়ে বসল। যেন এক গাদা কুকুরের ছানা জড়াজড়ি করে পড়ে আছে।

একজন বলল, 'সেই গানটা ধর এবার।'

'কোন্টা?'

'সেই ঠাকুরের নাম রে। আমাদের গোরা শালার নাম।'

বলতে বলতেই তারস্বরে চিৎকার উঠল ঃ

'এহ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম হে'

সেই সঙ্গে এ ওর আরও এর পিঠে চালাল খোলের চাঁটি। এ ভজনার মধ্যেও ছিল গোরার চিল গলার 'সখী হে' বলে টান।

হঠাৎ একটা চিৎকারে ওরা সবাই থামল। দেখল, কামরাটাতে যাত্রী একজন আছে। কিন্তু যাত্রীটি ছিল বেঞ্চির তলায়। বোধ করি আত্মগোপনের আশায়। বুড়ো। ছুটো ভাঁটার মত চোখ, একমুখ দাড়ি আর সারা গায়ে একটা অজস্র তালিমারা আলখাল্লা।

খেঁকিয়ে উঠল, 'বলি কোন্ সুখে র‍্যা, অ্যাই কোন্ সুখে ?'

অর্থাৎ কোন্ সুখে এ চেঁচামেচি। গোরাদের দলটা এ বেঞ্চির তলার যাত্রীর দিকে এক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে রইল। লোকটা শাসিয়ে উঠল, 'ফের আমাকে জ্বালাতন করলে—'

অমনি গোরা টকাস্ করে তার এক বন্ধুর মাথায় চাঁটি মেরে বলল, 'এই, কেন জ্বালাতন করছিস্ রে ?'

বন্ধু আর এক বন্ধুর মাথায় মেরে বলল, 'আমি নাকি ? এই শালা তো।'

আবার সে মারল আর একজনের মাথায়। তারপরে দেখা গেল, গানের চেয়ে চেঁচামেচি আরও বেড়ে গেল, সেই সঙ্গে হুড়োহুড়ি আর কোস্তাকুস্তি। বুড়ো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত মুখে ঘটনাটা লক্ষ্য করতে করতে তেলচিটে আলখাল্লাটা এমন ভাবে ঝাঁকানি দিল যে একরাশ ধুলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বললে,— 'শালারা হনুমানের জার—।'

তারপর গাড়িটা একটা স্টেশনে দাঁড়াতেই বুড়ো দৃপ্ত ভঙ্গিতে আলখাল্লা ঝাপটা দিয়ে নেমে গেল, যেন রাজা দরবার ত্যাগ করছেন। বললে, 'আচ্ছা দেখে লোব।'

এতক্ষণে গোরাদের দলটা পাছায় চাঁটি মেরে হেসে গড়িয়ে পড়ল। ছুটে নেমে পড়ল বাইরে। একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ও দাদু, ও জগাই, ও মাধাই'—

বুড়ো ততক্ষণে আর একটা কামরাতে উঠে একটা বেঞ্চির তলায় আশ্রয় নিয়েছে আর বল্‌ছে, 'শালারা মাথার উকুনের হদ্দ।'

উকুনের হদ্দ দল আবার তেমনি জড়াজড়ি করে বসেছে। কিন্তু প্রত্যেক স্টেশনে তারা নামবেই। চুপচাপ বসেই যদি যাবে তা হলে আর ভাবনা ছিল কি। বোধ করি এই গান, মারামারি, খেলা, নিজেকে আর নিজের সব কিছুকে ভুলে থাকার এ অবিশ্রান্ত উন্মাদনা না থাকলে এ দীর্ঘ পথ, সময় হত মরুভূমি ও রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণা। তা ছাড়া, পথ অতি দুর্গম। কোথায় বাঘের মত ওৎ পেতে আছে ক্রু, মোবাইল কোর্ট, পুলিস, ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড আর কালকেউটের মত সিভিল সাপ্লাইয়ের গুপ্তচর, বলা তো যায় না।

ভোর হয়ে আসছে। হাজারো মেঘের ভিড় আকাশে, তবু মেঘে মেঘে অপ্রতিরোধ্য বেলা আসছে। পূবের ধূসরতায় যেন ছাই চাপা মুক্তোর জেল্লা। টেলিগ্রাফের তার যেন একটা দিকপাশহীন বেহালার তার। সেই তারে তারে জটলা ন্যাজঝোলা পাখীর।

যাত্রী বাড়ছে। বাড়ছে কোলাহল। ভিড় বাড়ছে, গোরার সহধর্মীদের। মেয়ে, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ। যেতে হবে দূরে, বহুদূরে। এক জেলা থেকে আর এক জেলায়, পথ মাঠ ভেঙে, গাঁয়ে হাটে। তারপর ফিরে আসতে হবে এখানে, রেশন এলাকায়, কর্ডনের অবরোধ ভেঙে।

বিড়ি খাচ্ছে গোরা। খাচ্ছে না, ফুঁকছে। বুড়ো মদ্দ হদ্দ হয় তার নাক মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুনো দেখলে। স্টেশনের ধারে কোয়ার্টারের জানালায় বসে একটা ছেলে পড়ছিল, 'সাজাহান অ্যাঁ সাজাহান অত্যন্ত হৃদয়—' কিন্তু থেমে গেল পড়া, চোখাচোখি হয়ে গেল গোরার সঙ্গে।

গোরা চোখ নাচিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কি পড়ছিস ? বিড়ি খাবি ?'

বিড়ি ? ছেলেটার চোখে কৌতূহল, বিস্ময় ও ভয়। বুক জোড়া কপাটে কপাটে যেন হাজারো করাঘাত পড়ল। খিল খিল করে হেসে চলন্ত গাড়িটাতে গোরা ন্যাকড়ার ফালির মত উড়ে গেল। হাসির রেশটা একটা ভয় ব্যথা আনন্দের শিহরণ রেখে গেল শুধু জানালায়।

হঠাৎ যেন থম্‌কে যায় গোরা। বুকের দ্রুত তালে ভাঁটা পড়ে মন উজানে চলে। জলা মাঠে ছিটে বেড়ার ঘর, এক গাদা পুতুল আর পেট-উঁচু মা। পেটের বোঝার ভারে নত, চোখের কোল বসা, চোপসানো গোল, একটা অর্থহীন যন্ত্রণাকাতর চাউনি। সেখানে জানলা নেই, সবটাই খোলা, নয়তো সবটাই বন্ধ। ভয় কৌতূহল বিস্ময় আনন্দ নেই। একটা তীব্র হাহাকারের অসহ্য নৈঃশব্দ্য আর কিসের তাড়নায় দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে চলা কিংবা আচমকা একটা সুরতালহীন ভাঙা স্বর, 'আর বিড়ি খাস্‌নি বাবা!'

চকিতে গোরার মুখের উপর একটা থাবা পড়ে আবার উঠে গেল। দেখা গেল তার মুখের বিড়িটা আর একজনের মুখে চলে গিয়েছে। সেটা নিয়ে আর একজন, তারপরে আর একজন, তারপরে আবার হল্লা ও চিৎকার।

শহরতলীর ভিড়। রেল লাইনের ধারে ধারে কারখানা, বস্তি, ধুলো, ধোঁয়া আর মানুষ। মানুষ গাড়িতে। যাত্রী, অ-যাত্রী, ভিখিরি, হকার। বৈরাগী গাইছে:

গৌর বিনা প্রাণে বাঁচে না। কি যন্ত্রণা—

গোরা বলল চেঁচিয়ে, 'কি যন্তনা বল না গো! এখেনেই আছি।'

সবাই হেসে উঠল গাড়ী শুদ্ধ। গোরা আরও গম্ভীর হয়ে বললে, 'অ! ঠিক ধরেছি, আর বলতে হবে না! দুটো পয়সার যন্ত্রণা তো!' আবার হাসি। কিন্তু বৈরাগী ভিখিরির পিত্তি জ্বলে গেল। গোরা আবার বলল, 'তা কি করব বল। আমি যে এখন গোরা এস্‌মাল্‌গার হইছি গো!'

গাড়ি থামতেই এক গাদা মেয়েমানুষ হুড়মুড় করে ঢুকল। তাদের কাঁধে আর কোমরে চটের ব্যাগ। এরা সব গোরাদেরই সহযাত্রিনী। গোরা বলে এস্‌মাল্‌গারিনী। এদের মাঝে সুবালা হল গোরার বান্ধবী। গোরা বলে, আমার বিষ্ণুপ্রিয়া।

সুবালার ডাঁটো বয়স। আঁটো মেয়ে, খাটো গড়ন। ঘরে আছে পিঠোপিঠি দুই ছেলে। তারা একটু দড়ো হয়েছে। তিন বছর ধরে স্বামী নিখোঁজ, আর সুবালা রেফিউজী, কলোনীবাসিনী! কপালে আর সিঁথিতে জ্বল জ্বল করে সিঁদুর আর কি করে জানি না তার কালো মুখে সাদা দাঁতে নিয়ত ঝলমল

করে হাসি। অতএব যা বলতে হয় তাই কলোনীঘরণীরা বলাবলি করে, 'পোড়া কপাল তোর বেঁচে থাকার আর সিঁদুর পরার। তোর কোন্ যমের ঘরে রইল সিঁদুর। তাকে রাখলি তুই মাথায়। ও, চাল না টিপেই বুঝি, ক-ফুট হল।' সুবালারও নাম আছে পুলিসের খাতায়। সাত-দিন হাজতবাস করেছে সে বে-আইনী চাল বহনের অপরাধে।

আর এ পেশায় এ পথে, সহস্র চোখও তার দিকে বাড়ানো হাতের মাঝে সে নজর করল গোরাকে। ঘরে তার দুই ছেলে, বাইরের সারা দিনের জীবনে সে বোধ হয় স্নেহ দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিল তাকে। কিন্তু গোরার জীবনধারণের ক্ষেত্রে স্নেহ শাসন ভয় আইন শৃঙ্খলাটাই বে-আদবি।

সে পরিষ্কার বলে দিয়েছিল, 'তুমি কিন্তন্ আমার বিষ্ণুপ্রিয়া।'

সুবালা খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল, 'কেন, আমি—আমি তো শচীমাতা।'

একটা অদ্ভুত গোঁ ধরেছিল গোরা, 'সে আমার ঘরে আছে। তা হবে না।'

ফিক্ করে হেসে উঠতে গিয়ে চকিত যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল সুবালার গলা। দেখেছিল, তার সামনে সেই উসকো-খুসকো ক্ষুধার্ত ছেলেটার বয়স গৌণ, এ সংসারে ও একটা মস্ত দিগ্‌গজ। বয়সটার কথা গোরা নিজেও ভুলে গেছে। তাই তার দাবি আর দশটা বয়স্ক পুরুষের মতই।

কান্না চেপে অদ্ভুত হেসে বলেছিল সুবালা, 'আচ্ছা, তাই হল গো গোরাচাঁদ।'

হোক মিথ্যে, তবু সেই ভালো। সুবালার হৃদয় তো আর মিথ্যা নয়, আর সেই থেকে তাদের দলের মধ্যে এ মজার কাহিনী রাষ্ট্র হয়ে গেল। আসলে যেটা ঘটল, সেটা সুবালার কাছ থেকে গোরাচাঁদের দৈনিক এক আনা চায়ের বরাদ্দ। সম্পর্কের মধ্যে এ নগদ আদায়ের আত্মীয়তা ছাড়া আর কারো কিছু বোধকরি দরকার ছিল না। এ নিয়ে যারা টিপ্পনি কাটত, তারা হল সুবালার বয়স্ক মেয়ে পুরুষ সঙ্গীরা।

কে চেঁচিয়ে উঠল, 'গোরা, তোর বিষ্ণুপিয়ে এয়েছে।'

অমনি গোরা গান ধরল,

পরাণ ধরে বসে আছি, তোমারি পথ চেয়ে গো—

সুবালা খিল খিল করে হেসে ওঠে। অচেনা যাত্রীর দল অবাক হয়। একটু রসসন্ধানীও হয়ে ওঠে। মুহূর্তে সুবালা চুম্বক হয়ে ওঠে একটা।

সুবালার মনের মধ্যে একটা চাপা লজ্জাও হয়। তার সঙ্গিনীরা বিরক্ত হয় কেউ, কেউ হাসে।

গোরা বলে ঠোঁট উল্টে, 'তোমাদের ইস্টিশানটা বাপু বড় দূরে।'

সুবালা হেসে বলে, 'তোর বুঝি তর্ সয় না?'

গোরা তার কোঁচকানো গালে হাসে আর ভাঙা নীল দাঁতটা জিভ্ দিয়ে ঠেলে। ভাবে, কিসের তরের কথা বলছে সুবালা। সেই চারটে পয়সার, না, সুবালার। বলে, 'তর্ আবার কিসের?'

সুবালা বলে, 'আমার জন্যে?'

গোরা সমানে সমানে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ গো, তুমি যে বিষ্ণুপিয়া।'

বেশী ঘাঁটায় না সুবালা। জানে, গোরার ছোট বড়, চেনা অচেনা, কোন মানামানি নেই। চারটে পয়সা দিয়ে বলে, 'যা পালা।'

বলতে হয় না। পয়সা পেয়েই লাফ দিয়ে উঠে পড়ে গোরা। জংসন স্টেশনে নামতে গিয়ে দরজার দিকে ছুটতে গিয়ে কারো হাঁটুর গুঁতো মাথায় চাঁটি ঠকাঠক্ পড়ে। সে সব যেন গোরার গায়েই লাগে না। যেন কার পিঠে বা পড়ছে। জংশন স্টেশনটা আসতেই সে কোন রকমে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। একা নয়, সঙ্গীরাও আছে পিছে পিছে।

চার পয়সা দিয়ে এক গেলাস চা নিয়ে গোরা দু-এক চুমুক না দিতেই আর একজন চুমুক দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন, তারপর আর একজন। সেই সঙ্গে কাড়াকাড়ি খেলার হাসি। যেন একটা পাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক গাদা কুকুরের বাচ্চা। মুহূর্তে দেখা যায়, তপ্ত চা ভর্তি গেলাস একেবারে সাফ। এমন সাফ, বুঝি ধুতেও হবে না।

চা-ওয়ালা কটূক্তি করে এক হ্যাঁচকায় গেলাসটা ছিনিয়ে নেয়, 'শালা ভিখ্‌মাঙ্গার দল।'

'ভিখ্‌মেগো নয় হে, এস্‌মাল্‌গার।' জবাব দিল গোরা।

চা-ওয়ালা বুঝল না, জবাবও দিল না।।

কিন্তু চা চেটে ওদের অতৃপ্ত রসনা যেন লকলকিয়ে ওঠে। খাওয়ার পয়সাটা ওরা আরও দূর মফস্বলে গিয়ে খরচ করবে। সেখানে ভাত দুটো বেশী পাওয়া যায়।

একজন বলল, 'মাইরি, আমারও যদি এট্টা বিষ্ণুপিয়ে থাকত।'

আপসোসটা বোধ করি সকলের। সকলেই চুপ করে থাকে।

গোরা খুব নির্বিকারভাবে তাচ্ছিল্য ভরে বলে, 'বে-টা এবার করে ফেলব।'

এমন গম্ভীরভাবে বলে যে তার সঙ্গীরা সন্দেহ করলেও প্রশ্ন করতে সাহস করে না।

একজন বলে ফেলে, 'তোর চে তো বড়।'

গোরা বলে, 'কিসে?'

'বয়সে?'

'ফুঃ!' যেন ফুঁ দিয়ে ওড়ানো ছাড়া গোরার এতে জবাবই নেই।

গাড়ি ছোটে পূবে উত্তরে বাঁক নিয়ে। শহরতলীর কারখানা এলাকা ছেড়ে এসে পড়ে দিগন্তবিসারী মাঠ গ্রাম। বেড়ে যায় স্টেশনের দূরত্ব।

বেলা বাড়ে মেঘে মেঘে। কখনো বা গোমরা মুখে হঠাৎ হাসির মত চকিত রোদ দেখা দেয়।

গোরাদের জীবনটাও এই মেঘেরই মত। বয়সটা যেন মেঘ চাপা সূর্য। হাজারো কষ্ট, যন্ত্রণা, নিষ্ঠুরতা ও পাকামি থাক, চাঞ্চল্য যেন উপচে পড়ে। চুপ করে বসে থাকা যে কুষ্টিতে লেখা নেই। তাই চলন্ত গাড়িতেই শুরু হয় খেলা। ইঁদুর আরশোলার মত এর পায়ের তলা দিয়ে, ওর ঠ্যাঙের তলা দিয়ে। কখনো বা একেবারে পা-দানি ধরে ঝুলে পড়ে বাইরে, নয়তো কামরা থেকে কামরায় যায় ছুটে।

যাত্রীরা গালাগালি দেয়, খেঁকিয়ে ওঠে। ওরা ভ্রূক্ষেপ করলেও আবেগ বাগ মানে না।

সে খেলার দিকে চেয়ে চেয়ে সুবালা শিউরে শিউরে ওঠে। তারও জীবনের বিড়ম্বনাটা যেন মেঘের মত, আর বুকের ভেতরে যেখানটায় শিহরণ, সেখানটা মেঘচাপা সূর্যের মত। হাজারো অভিশাপ ওইখানে ম্লান। ঘরে দুটোকে রেখে আসার জন্য উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা এখানে গোরাকে ঘিরে বুঝি মগ্ন হয়ে থাকে। সুযোগ বুঝে গোরার সেই পঞ্চান্ন বছরের বুড়ো বন্ধু সুবালার কাছেই গোরার ব্যবহার সম্পর্কে নালিশ করতে বসে। 'ছোঁড়া ভারী হারামজাদা, দেখ, যাচ্ছিস বিনি টিকিটে, করছিস বেআইনী কাজ, আবার প্যাসেঞ্জারের গায়ে পড়বে।' সুবালা বলে, 'ধরে আনো না।'

'কে? আমি?' মাথা ঝাঁকিয়ে বলে বুড়ো, 'রামো রামো। আমার একটা মানজ্ঞান নেই?'

সুবালা অবশ্য বলে না বুড়োকে যে, গোরা যখন রোজ তার চালের বস্তা মাথায় করে এনে গাড়িতে তুলে দেয় তখন কোথায় থাকে এ মানজ্ঞান।

একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'গোরা, একটা মামা রয়েছে রে।'

মামা মানে ক্রু-ম্যান। গোরা বলল, 'কোথা?'

'ফ্যাস্ট কেলাসে ঘুমোচ্ছে।'

গোরা বলল, 'খবরটা বিষ্ণুপিয়েকে দিয়ে আয়।'

অর্থাৎ সকলকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। একটা ক্রু-ম্যানের পক্ষে এ চাল বহনকারী বাহিনীকে অবশ্য ধরে নামানো সম্ভব নয়। তবু সাবধানের মার নেই। একজনকে মাঝপথে নামিয়ে দিলেই তো সে গেল। আর গোরার ভাষায় এই এস্‌মাল্‌গার দলের সমস্ত খবর পাওয়া যাবে গোরাদের কাছেই। এদের ধরবার জন্যে কোথায় কোন শত্রু আত্মগোপন করে আছে, এরা নানান্ রকমে সে সন্ধান যোগাড় করে নেয়।

'মোশায়, এট্টুস আগুন দেবেন?' গোরা বিড়ি মুখে দিয়ে দাঁড়াল একজনের সামনে।

লোকটি ভদ্রলোক। তিনি সিগারেট খেতে খেতে একবার খালি রাগে কট্মট্ করে গোরার দিকে তাকালেন।

কিন্তু বৃথা। ওর কাছে এ আত্মসম্মান, অপমান, ছোট বড়র কোন স্থান নেই। এ সমাজের শৃঙ্খলা ও আইনকে যে-কোন উপায়ে ভেঙ্গে পলে পলে ওকে নিশ্বাস নিতে হয়। ও কিশোর নয়, বালক নয়, ছাত্র নয়, এমন কি একটা আপিস বয়ের আনুগত্যও ওর জানা নেই। ও এ যুগের হেড্ অব দি ফ্যামিলি। একটা মস্ত পরিবারকে পালন করে। ও এস্মাল্গার। সভ্যতা ভদ্রতা এখানে অচল।

আবার বলল, 'দেবেন না?'

ভদ্রলোক পাশের লোকটিকে বললেন, 'দেখলেন মশাই সাহসটা?'

কিন্তু যাকে বললেন, বোধ হয় দেখে বলেননি লোকটা কোন্ কোয়ালিটির। সে বলে উঠল, 'শালাদের খালি উঠতে বসতে লাথাতে হয়।'

'মাইরি!' বলেই গোরা খানিকটা সরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ক'রে গেয়ে উঠল :

যে বলে আমাকে শালা
তার বোনেরে দিব মালা।

অমনি একটা রাগ ও হাসির রোল পড়ে গেল। আর শালা বলেছিল যে লোকটা, সে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে গোরার উপর। চলল কিল, চড়, লাথি, ঘুষি আর গালাগাল।

গোরার বন্ধুরা হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। একটা ক্ষীণ প্রতিবাদও উঠল কামরাটার মধ্যে। সুবালা ওইখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠল গোরা গোরা বলে।

ততক্ষণে গোরাকে মুক্ত করে নিয়েছে তার বন্ধুরা, আর সে লোকটা আস্ফালন করেই চলেছে, 'মেরে ফেলে দেব আজ কুত্তার বাচ্চাটাকে।'

কিন্তু সবাই দেখছিল গোরাকে। মার খেয়ে তার তামাটে মুখটা আরও তামাটে হয়ে উঠেছে। চুলগুলো ঢেকে ফেলেছে প্রায় অর্ধেক মুখটা। তার ভেতরে শুকনো চোখ দুটো জ্বলছে ধক্ ধক্ করে।

পরের স্টেশনে যখন লোকটা নামতে গেল, সবাই দেখল একটা প্রকাণ্ড শরীর ধপাস্ করে আছড়ে পড়ল প্ল্যাটফরমের উপর আর আঁট কাছাটা পড়ল ঝুলে।

পড়াটা এমনি মোক্ষম হয়েছে যে, সে ওঠবার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল আর সেই সঙ্গে একটা কাঁচা পাকা দোআঁসলা গলার সমবেত হাসির শব্দ ভরে দিয়ে গেল আকাশটা।

আবার খেলা। বোঝবার উপায় নেই কিছুক্ষণ আগে গোরা মার খেয়েছে। এরকম ঘটনা তো প্রায় রোজই ঘটছে। বিড়ি খাচ্ছে, থুথু ফেলছে এখানে সখানে, বক্ বক্ করছে, পানের বোঁটা চিবোচ্ছে পানওয়ালার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে, ফেরীওয়ালার কাছ থেকে আচারের নমুনা চেয়ে খাচ্ছে। কাশছে ঘং ঘং করে। যেন জ্বরের ঘোর। যেন পাগলাটে নিশি ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। যেন থামলেই সব শেষ হয়ে যাবে এখুনি। সময় নেই।

আর কতদূর? দুটো জংসন স্টেশন পেরিয়ে গিয়েছে। দূরের ওই স্টেশনটায় ওগুলো কি দেখা যায় সারি সারি? মোবাইল? না, জলার কাশবন।

বেলা বাড়ছে। রোদ নেই, পূবের ঝোড়ো হাওয়া জলো জলো।

চোখ জ্বলছে, খালি তেষ্টা পাচ্ছে, পেটটা চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু এখনো যে অনেক দূর।

কি দরে আজ চাল পাওয়া যাবে, কে কত সের কিনবে, কে কত নিয়ে এসেছে, সবাই আলোচনা করে।

গোরা হঠাৎ কখনো কখনো ছুটে আসে সুবালার কাছে। ডাকে, 'বিষ্ণুপিয়ে।'

সে ডাক যেমনি অদ্ভুত, তেমনি হাস্যকর। বলে, 'তুমি কবে আমার সঙ্গে যাবে?'

সুবালা যেন ছোবল খেয়ে হাসে। বলে, 'যবে তুই নিয়ে যাবি।'

তারপরে হঠাৎ গোরা আনমনা হয়ে যায়। চোখ দুটো শূন্যে নিবদ্ধ, কিন্তু সেখানে যেন কত লুকোচুরি খেলা।

নিঝুম গেঁয়ো স্টেশনটার জলা ঝোপ থেকে সেই পাখীটা ডাকে কুর্ কুর্ করে, 'ওগো, খোকা কোতায়! খোকা কো-তায়!' গোরার চোখে ভেসে ওঠে

একটা গ্রাম, ঘর, আর নিকনো দাওয়া। মা সেই দাওয়ার বসে নাদা-পেটা ছেলেকে তেল মাখায়। ছেলে কাঁদে তেলের ঝাঁজে। মা বলে, 'কেঁদোনি, সোনা, কেঁদোনি। তোমারে ফটিক জলে নাওয়াব, দুধে ভাতে খেতে দেব, সোনার কপালে চুমু খাব।'

সে কথা কোন্ জন্মের? আবার চোখে ভাসে, শহরতলীর কারখানায় রাবিশের স্তূপ। তার পাশে বিস্তৃত জলা, ছোট ছোট ছিটে বেড়ার ঘর, সারি সারি কতগুলো রুগ্ন পুতুল আর পোয়াতী মা। মুখে কোন কথা নেই, শুধু নিষ্পলক অদ্ভুত দুটো চোখে চেয়ে থাকা, এ দুরন্ত জীবনেও এ চোখের কথা সরল, স্বরবর্ণের মত সহজ!

হঠাৎ গোরা আনমনে ফিস্‌ফিস্ করে ওঠে, 'মা।···মা!'

সুবালার নিষ্পলক চোখে কিছুই এড়ায় না। সে দেখে, গোরা যেন সত্যিই এক স্বপ্নাচ্ছন্ন তন্ময় কিশোর। সে অমনি ঝুঁকে পড়ে ডাকে, 'কি রে গোরা, কি হয়েছে?'

বিমূঢ় গোরা অবাক চোখে সুবালার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মুখটা ঠেকে সুবালার বিশাল বুকের কাছে। ভাবে, মা বুঝি ডাকছে। তার মা।

পর মুহূর্তেই সম্বিৎ ফিরে আসে। ততক্ষণে কি যেন ঠেলে আসছে গলায় আর চোখে। কিন্তু তাকে কিছুতেই আসতে দেওয়া হবে না। এ জীবনে আর যাই হোক, চোখের জল ফেলে অধর্ম গোরা করবে না।

হঠাৎ কাশিতে হাসিতে একটা বিকট শব্দ করে সে ছুটে খেলায় যোগ দিতে যায়। অমনি একটা হৈ হৈ পড়ে যায়। যেন ঝোড়ো হাওয়ায় সবাই শশব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কে প্রাণ খুলে গান ধরেছে,

বৈরাগী না হইও নিমাই, সন্ন্যাসী না হইও,
নগর ছানিয়া দিব, পরাণ ভরে খাইও।

আর গোরা একজন যাত্রীকে হাত মুখের ভঙ্গী সহকারে বল্‌ছে, 'জেলের ভয় দেখাচ্ছেন? মোশাই, তিনবার ঘুরে এয়েছি।' ভাঙা দাঁত আর মুখের

দাগ দেখিয়ে বল্‌ছে, 'পড়ে মরব? তা-ও হাসপাতালে থেকে এয়েছি। আমার নাম গোরাচাঁদ।' যাত্রীটি একমুহূর্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললে, 'ডেঁপো।'

'ডেঁপো নয় বাবু, ভেঁপু।' বলে মুখের একটা বিচিত্র শব্দ করে সরে গেল। তারপরেই হঠাৎ, 'সখী একবার ফিরে চাও গো।' বলে তীব্র চীৎকার।

কিন্তু আর কতদূর! এ গাড়ীটা মাঝে মাঝে থামতে পারে। ওরা যে পারে না। বিড়ি ভালো লাগে না। প্যাচ প্যাচ্ করে ফেলার মত থুতুও নেই মুখে। চোখ ছোট হয়ে আসে, গা-টা ঘুলোয়। ওই লোকটা কি সিভিল সাপ্লাইয়ের বাবু? না, ওটা তো একটা এস্‌মাল্‌গার।

বেলা বাড়ে। এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যেন রেলগাড়িটাকে মনে হয় ঠেলাগাড়ি। তবু রোদে নয়, ছায়ায় বাড়ে বেলা।

তারপর একসময় সবাই হুড়মুড় করে নামতে আরম্ভ করে। একটা ছোট্ট স্টেশন, যেন কুলগোত্রহীন চালচুলোহীন গেঁয়ো ছেলের শহুরে ঢংএর মত। সমান্তরাল পাথুরে প্ল্যাটফরম, টিকিট ঘর, সাইনবোর্ড, তারপরেই বেতবন ও আসসেওড়ার ঝোপ। ধার দিয়ে সরু পথ চলে গেছে মাঠের গিকে। বুনো বুনো গন্ধ।

ওরা সব গাড়ি থেকে নামতেই যেন যাত্রীরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে, 'শালা, মাথার উকুন নামল।'

উকুনের দল পিলপিল্ করে রাস্তায় নামে। যাবার সময় স্টেশনের কুলিটাকে সবাই দুটো করে পয়সা দিয়ে যায়। ওটাই রেওয়াজ। কে আর রোজ রোজ টিকিটের জন্য বিবাদ করে।

চলে সবাই গঞ্জের দিকে। এখান থেকে ক্রোশখানেক দূর। তারপর ছোট নদী। নদীর ধারে গঞ্জ। সেখানে চালের আড়ত।

মাটি পায়ে ঠেকতে যেন আবার একটু দম ফিরে পায় সবাই। এখানে নেমেছে একটা দল মাত্র। বাদবাকীরা আগে নেমেছে। পরেও নামবে কেউ কেউ!

এ-দলটার সবার আগে চলেছে গোরা, তার বন্ধুরা চলেছে জোয়ান বুড়ো,

মেয়ে পুরুষ। যেন একটা মিছিল চলেছে। ধুলো আর ধূসর বেলায় যেন একটা ছায়া মিছিল।

মাঠে মাঠে ধানে পাক ধরেছে। নিরালা, জনশূন্য মাঠ।

হঠাৎ ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে আরম্ভ করে গোরাদের দলটা। যেন উচ্ছ্বসিত চড়ুই দলের হুটোপুটি খেলা।

তারপরে গঞ্জ। অমনি সকলে অন্য মানুষ হয়ে ওঠে। যে যার কোমরে পকেটে হাত দেয়। বার করে তাদের প্রত্যহের মূলধন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গোনে কত আছে। জানে না কত আছে, তবু গোনে। সন্তর্পণে মুঠো করে ধরে। তাদের জীবন, সেই সঙ্গে আরও অনেকের। যে পয়সা থেকে মরে গেলেও আধপয়সা ছাড়া যাবে না। এমন কি এক পয়সার লজেন্স, দুটো মুড়ি বিস্কুট কিংবা বুড়ির মাথার পাকা চুল। কিছুই না। সাধ আস্বাদ ক্ষিধে ভালবাসাও নয়।

আড়ত দু-তিনটে। সবাই ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে ব্যাগ আর পয়সা নিয়ে।

দেখা গেল দর একটু চড়েছে। শরতের শেষ, হেমন্তের শুরু। নতুন চাল বাজারে বেরোয়নি এখনো। চাষী বিক্রেতা একটাও নেই। শহরের লোকগুলো হন্যে হয়ে ফিরছে চালের জন্য। শহরে চাল নেই রেশনের আধপেটা ছাড়া। শহরের খুচরো দোকানওয়ালারা তাই এখন ভারী খাতির করে গোরাদের।

ওদিকে নদীর বুকে নৌকা বোঝাই হচ্ছে চাল। যাবে কলকাতায়, কালোবাজারে। যেমন যাবে গোরাদেরটা। কিন্তু ওদের নেই মোবাইল কোর্ট, পেছনে সিভিল সাপ্লাইয়ের গুপ্তচর, পথে পথে পুলিসের জুলুম। গোরা বলে, 'ওরা এস্‌মাল্‌গার লয়, সরকারের বোনাই, তাই ঘর-কারবার।'

তারপর সবাই যায় গঞ্জের হোটেলে খেতে। কাঁচা মেঝেয় শুকনো কলাপাতা। কিন্তু ভাতের গন্ধে যেন চারদিক ম ম করছে। একটু ডাল আর ভাত। রেট চার আনা।

গোরারা সবাই পাতাপাতি করে খায়। কারো কম কারো বেশী হয়।

তারপর হঠাৎ খালি পাতার দিকে দেখে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সবাই কেমন বোকার মত হাসে। আর এঁটো পাতাগুলো যেন সদ্য ধোয়া পাতা হয়েছে।

ম্যানেজারকে পয়সা দিয়ে, নদীর জলে আঁচিয়ে উঠে গোরা বলে, 'শালা কেষ্ট ঠাকুরের খুদ খাওয়া হল। এই ছাখ্।' বলে পেটটা ফুলিয়ে দেখায়। আর একজন সেটা বাজায়। হাসি আর হল্লায় মনে হয় যেন বর্গী এসেছে গঞ্জে।

এসমাল্‌গারিনীর দলও খেতে বসে হোটেলে। সুবালা বাইরের দিকে তাকিয়ে আনমনে ভাতের গরাস তোলে মুখে। বাইরে সদ্য খাওয়ার ঢেঁকুর তুলে সেইজন সেই গান গেয়ে উঠেছে ঃ

বৈরাগী না হইও নিমাই, সন্ন্যাসী না হইও।...

আবার ফিরে চলা। এবার আরও হুঁশিয়ার। পদে পদে আরও ভয়, আরও উৎকণ্ঠা। আর সে শুধু প্রাণে নয়, ধনেও বটে। প্রাণ গেলেও এ ধন দেওয়া যায় না। এ যে মূলধন।

সবাই অভিন্ন, একক এখানে। এক কথা, এক চিন্তা, এক ভয়, এক ভাবনা। এর বোঝা ও নেয়, ওর বোঝা এ নেয়। গোরা বলে, 'বিষ্ণুপিয়ে, তোমার বোঝাটা আমার মাথায় দেও।'

সুবালা হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে, 'আর মরদগিরি করতে হবে না, চল দি নি।'

একটা বুড়ি তার বোঝাটা গোরার মাথায় তুলে দিয়ে বলে, 'নিবি তো, এটা নে বাবা।'

গোরা বলে, 'লোব গো বিষ্ণুপিয়ে?'

'পারলে নিবি।' জবাব দেয় সুবালা। কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়, রুষ্ট হয় বুড়িটার উপর।

পিঠটা বেঁকিয়ে ঝুঁকে চলে গোরা। যেন একটা তুমড়ানো কঞ্চি।

দেখা যায়, সবাই নানান কথায় জমে উঠেছে। পারিবারিক আর অতীত জীবন। কে কবে কাঁড়ি কাঁড়ি ভোগবতী চাল রেঁধে খাইয়েছে, কার উঠোন ভরে একদিন অমন পনের সের চাল চড়ুই পায়রায় খেয়েছে। কার ছেলে একটা

চাকরি পাবে, কে পাকিস্তানে গিয়ে তার জমিজমা বিক্রি করে দু-পয়সা নিয়ে আসবে, কার নিখোঁজ ছেলে নাকি সত্যি ডাক্তার ছিল।

সুবালা ভাবতে চেষ্টা করে তার নিখোঁজ স্বামীর কথা। আশ্চর্য! কটা বছর, তবু মুখটা একদম মনে পড়ে না। গোরা হঠাৎ বলে, 'বিষ্ণুপিয়ে।'

'কিরে।'

গোরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার কিছু ভালো লাগে না।'

হঠাৎ যেন সুবালার ফিক্ ব্যথা লাগল বুকে গোরার গলা শুনে। দেখে গোরার ক্লান্ত হাঁ মুখ, মাথার বোঝার তলায় দুটো ম্লান চোখ, সমস্ত মুখে যেন একটা কিসের আচ্ছন্নতা।

সুবালা তাড়াতাড়ি তাকে একেবারে বুকের কাছে টেনে জিজ্ঞেস করে, 'কেন রে, কেন?'

জবাব দিতে গিয়ে ফিক্ করে গোরা হেসে বলে, 'তোমার গায়ে কি সোন্দর গন্ধ।'

'ওমা! সে আবার কি?'

'হাঁ গো, আমার মার মতন।'

সুবালা আছাড় খেতে গিয়ে সামলে নেয়।

বেলা ঢলো ঢলো। আকাশ আরও কালো হয়। এবার স্টেশন, তারপরে গাড়ি।

গাড়িতে তুমুল ব্যাপার। তবে প্রাত্যহিক। মালে-মানুষে ঠাসাঠাসি। দরজা দিয়ে জানালা দিয়ে গলে গলে ঢুকছে ব্যাগ আর মানুষ। গালাগাল, শিশুর কান্না, হকারদের চিৎকার। যেন গাড়ি নয়, চলন্ত হাট। কে ঠেলছে আর ঠেলা খাচ্ছে, কোন ঠিক নেই।

এক ফোঁটা গোরা যেন একটা অসুর। এরটা তুলে দেয়, ওরটা এগিয়ে দেয়। শেষটায় চালবহনকারীর দল গাড়ির ছাদে উঠতে আরম্ভ করে। প্রাণের আশঙ্কা, কিন্তু না হলে নয়।

গোরা যেন যাদুকরের মত ভেতরে জায়গা করছে। এ একটা লাঠি মারে,

ও একটা চড়। যা-ই করো, উপায় নেই। বেশী কিছু বললে গাঁক করে কামড়েও দিতে পারে। কে যেন বললে, 'এই হারামজাদা!'

গোরা বললে, 'কে তবে কলির গাধা?' বলেই সড়াৎ করে এক বেঞ্চির তলা দিয়ে আর এক বেঞ্চির তলায় চলে যায়। লোকজন চিৎকার করে ওঠে। কেউ বলে চোর, কেউ পকেটমার।

সে বলে, 'আজ্ঞে না, 'গোরাচাঁদ এস্‌মাল্‌গার।'

ছুটছে গাড়ি, আর প্রত্যেকটা স্টেশন থেকে উঠছে চালবহনকারীর দল। মেয়েপুরুষ বাছবিচার নেই। এ ওর বুকে, ও এর মুখে। তবে সেটা ভাববার অবকাশ নেই।

এর মাঝেও আছে গোরাদের ছুটোছুটি। আর প্রত্যেকটা স্টেশনে নেমে নেমে সন্ধান করছে, সামনে বিপদ ওৎ পেতে আছে কি না। আবার দেখা যাচ্ছে দল বেঁধে সব স্টেশনে প্রস্রাব করতে বসেছে।

তারপরে একটা আপগাড়ির সঙ্গে তাদের দেখা হতে শোনা গেল সামনের জংসনেই মোবাইল আর সিভিল সাপ্লাই রয়েছে। অমনি কেউ কেউ ব্যাগশুদ্ধ লাফিয়ে নামতে আরম্ভ করে। যেন তাড়া খাওয়া ব্যাংএর দল ডোবায় পড়ছে কিন্তু সে আর ক-জন। গাড়ি ছেড়ে দেয়।

ট্রেনের শিকল কাঠের ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা। সবাই চিৎকার করে বলাবলি করছে ফিকিরের কথা। কিন্তু ফিকির নেই।

গোরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে শূন্যে। হাত দুটো ঝুলে পড়েছে। বিহ্বল, শূন্যমন। মনে পড়ল, জেল। সেটা কিছু নয়। কিন্তু মূলধন! ভাই বোন আর মা! তারা কি খাবে কাল? কেমন করে তাকাবে মা ওই অসহ্য অপলক দুটো চোখে। হঠাৎ সে তার ব্যাগ নিয়ে দরজার দিকে এগোয়।

বন্ধুরা বলে, 'ঝাঁপ দিবি?'

'না।'

'তবে?'

সুবালা ছুটে আসে। 'কোথা যাচ্ছিস্?'

'ছেড়ে দেও বিষ্ণুপিয়ে !' হাত ছাড়িয়ে দিয়ে পা দানিতে নেমে পড়ে গোরা। আর নয় বিষ্ণুপ্রিয়াকে। তার চেয়েও কঠোরতর পরীক্ষা সামনে !

একগাড়ি লোককে অসহ্য কৌতুহল ও উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখে পা-দানির শেষ ধাপে নেমে গেল। নিমেষে হারানো পাথুরে খোয়ার স্তূপ যেন জমানো সিমেন্ট। তিন হাত দূরে লাইনের বুক পিষে চাকা ঘুরছে ঘর্‌ঘর্‌ করে। আধ হাত নীচেই মাটি।

গোরার চোখ রক্তবর্ণ, মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। সারা মুখে ঘাম। হাতের নীল পেশীগুলো যেন ছিঁড়ে পড়বে। চকিতে মুখ বাঁধা চালের ব্যাগ হাতের মধ্যে গলিয়ে পা-দানির শেষ ধাপে ধীরে ধীরে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল আর একটু একটু করে তার দেহটা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল গাড়ির তলায়। আস্তে আস্তে উঠে গেল ঠিক চাকার উপরে ত্নটো বাঁকানো রড্‌ ও সংক্ষিপ্ত রেলিংএর মাঝখানে। চাকার ত্ন-তিন ইঞ্চি উপরেই তার একটা লিকলিকে ঠ্যাং ঝুলছে। কোন রকমে একবার ছুঁতে পারলেই মুহূর্তে ক্ষিপ্ত বাঘের মত টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে।

তারপরে যেন অত্যন্ত রাগে ও ঘৃণায় চলন্ত চাকাটার গায়ে সে বার বার থুথু ছিটিয়ে দিতে থাকে। গাড়ির ওপরে হাজারো গেল গেল শব্দ, বন্ধুদের উৎকণ্ঠা সুবালার মৃত্যু যন্ত্রণা সব যেন কেমন স্তব্ধ আড়ষ্ট বিকল হয়ে গেল।

তারপর জংসন স্টেশনের উন্মত্ত তাণ্ডব। পুলিস, মোবাইল কোর্ট, সিভিল সাপ্লাই গাড়িটাকে ঘিরে ধরে সবাইকে নামাতে থাকে। আর মার খিস্তি চিৎকার আর কান্না। ছড়িয়ে পড়ছে কারো চাল, ছিটকে পড়ছে মুখ থুবড়ে কেউ। মারো আর উতারো। পুলিশের লাঠিতে তৈরি হয় বেড়া। সেই বেষ্টনীর মধ্যে একদিকে মানুষের স্তূপ, আর দিকে চালের। চাল আর এস্‌মাল্‌গার।

গাড়ির ঘণ্টা পড়ল। সুবালা রুদ্ধ নিশ্বাসে বুক চেপে আপনমনে বলল, 'গোরা ধরা পড়বে না, কখনো না।'

কিন্তু পড়েছে। একটা তীব্র হট্টগোল ও ধস্তাধস্তির মধ্যে সবাই দেখল এক টুকরো ত্যাকড়ার মত তাকে নিয়ে সবাই টানাটানি করছে।

লাঠির বেষ্টনীর মধ্যে সবাই বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখল, অফিসারের সামনে তাদের গোরা, তাদের হিরো এস্মাল্গার। কি বলছে অফিসার। কিন্তু গোরা নিশ্চুপ।

তারপর এল একটা সরু বেত, খুলে দেওয়া হল গোরার জামা প্যাণ্ট। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল চালের স্তূপে তার পনের সেরের ব্যাগ। শেষবারের জন্য অফিসার চিৎকার করে উঠল, 'আর কোনদিন করবি?' গোরা শক্ত, নির্বাক। কেমন করে বলবে। সেখানে যে ওরা রয়েছে, মা আর ভাই বোন। তার বোবা মা। পরমুহূর্তেই বেতের ঘায়ের সপাং সপাং শব্দ ওই মানুষের স্তূপটাকে, স্টেশনটাকে, সর্বচরাচরকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে শিউরে তুলল। নেমে আসা রাত্রি যেন যন্ত্রণার কালিমা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

স্টেশনে আলো জ্বলছে। যেন অন্ধকার এখানে অনেক নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে।

গোরা এসে দাঁড়াল সেই মানুষগুলোর কাছে। উলঙ্গ, সারা গায়ে চিতাবাঘের মত লম্বা দাগ, হাতে জামা আর প্যাণ্ট। কিন্তু চোখে জল নেই, নাক দিয়ে শুধু সিকনি বেরিয়ে পড়েছে, ঠোঁটের দুই কষে ফেনা। ছায়াটা পড়েছে যেন উলঙ্গ আদিম কিম্ভূতাকৃতি একটা ওৎ পাতা মানুষের।

অসহ্য যন্ত্রণায় যেন সুবালার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে গেল। ঠাণ্ডা পাথরে জোরে ঠোঁট দুটো চেপে সে কেঁপে কেঁপে উঠল। সেই লোকটা অকারণ গুন্‌গুন করছে,

বৈরাগী না হইও নিমাই···

গোরার শূন্য চোখে ভাসছে, সেই কারখানার রাবিশের জলার ধারে, অন্ধকার আকাশের তলায় দুটো দিশাহারা চোখের অসহ্য প্রতীক্ষা। ঘরে ঘুমন্ত পুতুল, রুগ্ন একটা মানুষ, আর বাইরের অন্ধকারে বোবা মায়ের অপরিসীম তীব্র প্রতীক্ষা।

জয়নাল

জয়নাল আমার বন্ধু। সে থাকত, দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনের পূবে, তিন মাইল দূরে।...বিলান দেশ, তাই ছ'মাস সে আসত পায়ে হেঁটে, ছ'মাস নৌকায়।

যখন হেঁটে আসত, তখন তিন মাইল পুরো হাঁটতে হ'ত, যখন নৌকায় আসত তখন, ওই তিন মাইল হত দেড় মাইল।

কেন না, দোলাইগঞ্জের রেললাইনের উঁচু ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে এই যে দেখা যায় বহু দূর দিগন্ত ভাসিয়ে থই থই করছে বর্ষার জল, যার কোথাও বিস্তৃত কচুরিপানা বা জলঘাসের নোয়ানো মাথা, কোথাও আকাশের ছায়া টলটলে জলে, পাশে তার কলমী হিঞ্চের দাম উদ্দাম হয়ে ছড়িয়ে আছে বহু বাহু মেলে, কিম্বা কোথাও আচমকা জেগে ওঠা কিশোরী পাট গাছের সটান ডাঁটার অজস্র মাথা, এরই ধারে ধারে জয়নাল তার ডিঙ্গি নৌকাটি নিয়ে সোজা পাড়ি দিত ওই দিগন্তে মেশা গাঁয়ের কাল্‌চে রেখার দিকে। ওই যে দেখা যায় একটা মন্দিরের একটুখানি মাথা, তারও পিছনে ঝাপ্‌সা রেখা দুটি মসজিদের মিনার, ওইখানেই জয়নালদের বাড়ী। বন্যাকালে এ সোজাপথটুকু যেতে তাকে ভাঙতে হয় লালমাটীর তিন মাইল উঁচুনীচু বাঁকা পথ।

এই যে জল, এটা কোন নদী নয়, খাল নয়, নয় কোন গাঙ ; বহু খাল নালার মারফৎ এসে ছোট বিলের বুকে মহাসঙ্গম ঘটেছে ধলেশ্বরী ও শীতলাক্ষার, যার মৃদু আবর্ত নাকি তটকে দিয়েছে একেবারে ভাসিয়ে। দুয়ে মিলে এর এক স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ। হঠাৎ হাওয়ায় শিউরে ওঠা এ টলটলে জল ও তার বন, নীড়বিবাগী মাছখেকো পাখী ও ফড়িংএর ভিড়, কই, জিয়ল, ট্যাংরা ও পুঁটির আচমকা ভেসে উঠে পুচ্ছ নাড়ার চকমকানি ও চকিতে অতলে ডুবে যাওয়া,

আর উপরে মেঘভারাতুর উদার আকাশ, এসবের কথা যে বার বারই বলতে ইচ্ছে করছে, তার কারণ জয়নালের রূপ।

কেন না, জয়নালের কালোচোখের অতল চাউনি, তার চিকন শ্যামল রং, মাথায় অবিন্যস্ত শ্যাওলা রংএর চুল, বড় বড় সাদা ঝকঝকে দাঁতের হাসি, দীর্ঘ শক্ত শরীর এবং অখণ্ড নৈঃশব্দের মধ্যে বহুতল থেকে উঠে আসা অল্প ও গম্ভীর কথার স্বর, এসবের সঙ্গে ওই প্রকৃতির কোন তফাৎ নেই। ওই প্রকৃতি ও জয়নালকে দেখা যেন এক জনকেই দেখা।

জয়নাল দোলাইগঞ্জ পেরিয়ে গেণ্ডারিয়ার একটা হাইস্কুলে পড়তে আসত। আসত সকালবেলা মাথার শাক তরকারীর বোঝার উপরে পাঠ্যবই দড়ি দিয়ে বেঁধে। সূত্রাপুর বাজারে শাক তরকারী বিক্রী ক'রে ওখানেই এক মুসলমান মহাজনের গদীতে ব'সে পড়াশুনো করত। তারপর চান করে, নাস্তা করে চলে যেত স্কুলে। স্কুল শেষে বাড়ী।

তার সঙ্গে আমার পরিচয়টা স্কুলেই বটে, কিন্তু বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল স্কুলের পাঁচিলের বাইরে, শহরের সীমা ও দোলাইগঞ্জ পেরিয়ে, জলে স্থলে, মাঠে ঘাটে, জলে ডোবা পাটক্ষেতের ভিতরে ডিঙ্গি নৌকা ঢুকিয়ে তামাক খেয়ে আর কাঁচা বুকে তার ধক্ সইতে না পেরে হাসিতে কাশিতে স্তব্ধ বিল ও আকাশকে সচকিত করে দিয়ে।

জয়নাল মনযোগ দিয়ে স্কুলে পড়ত, আর বাড়ী ফেরার জন্যে তাড়াতাড়ি ছুটত পূবে।

আমি প্রায় কোনদিনই স্কুলে পড়তে যেতুম না, আর বাড়ী ফেরার কথা মনে হলেই আমার কিশোর মনে একটা তিক্ত বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠত।

জয়নাল বাড়ী ছেড়ে পালাবার কথা ভাবতেও পারত না, আমি বাড়ী থেকে প্রায়ই পালিয়ে যেতুম। জয়নালকে কোনদিনই মার খেতে দেখিনি, আমার গায়ে এক লাঞ্ছনার দাগ মিশে না যেতে আসত আবার উজান লাঞ্ছনা। জয়নাল শিষ্ট, আমি অশিষ্ট। সে গম্ভীর, আমি চঞ্চল। সে ছিল হিসেবী, আমি বেহিসেবী। মিতালিতে সে বিনীত, আমি দুর্বিনীত। আমাদের এ বিপরীত

নারকোলের সন্দেশ, বাজার থেকে কেনা ইরাণী খেজুর। বলেছিল, দোস্তির খাওয়া। তুই দিবি আমার মুখে, আমি দিমু ত'র মুখে, এইডা কানুন।

এক বনের মাঝে লুকিয়ে আমরা দোস্তির ভোজনপর্ব উপভোগ করেছিলুম।

এদিক ওদিক দেখে আমরা ডিঙ্গি ঢুকিয়ে দিলুম পাটক্ষেতের মধ্যে। সে যেন গহন অরণ্য। তায় আজ আবার পাটক্ষেতে লেগেছে মাতন। ডিঙ্গিও যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়।

আরম্ভ হয় তামাক খাওয়ার পালা। জয়নাল যতটা গম্ভীর হ'য়ে হুঁকো টানত, আমি আবার তা পারতুম না। এটা আমার কাছে ছিল যেন বিরাট কুটিল বাধা ডিঙিয়ে এক মহামুক্তির স্বাদ। জয়নালের বাড়ীতে ছিল না বিশেষ আপত্তি এই তামাক খাওয়ায়।

জয়নাল পাকা বুড়োর মত হুঁকো টানতে টানতে বলল, মধু, বাপজানে কয় যে, মেট্রিক পাশ করলে, মোক্তারি পড়াইব।

মোক্তারি? আমরা দু'জনে হো হো করে এসে উঠলুম গলা ছেড়ে, আমাদের চোখে বারবার ভেসে উঠল গোঁফওয়ালা এক বিদঘুটে বুড়োর মুখ, গোল চোখে তার ধূর্তের চাউনি।......মোক্তারি? যত ভাবি, তত হাসি।

আরো কি কয়, শুনছস্‌নি? বলে সে লুঙ্গিতে মুখ মুছে হাসে মিট্‌ মিট্‌ ক'রে।

আমি সে হাসির ভাবার্থ না বুঝে বললুম, কি?

বলতে তবু বাধে জয়নালের। বলে, কয়, এই বছর্‌ডা গেলে, আমারে নাকি সাদী দিব।

হ?

হ।

হাসিতে আমার পেট ফেটে যাওয়ার যোগাড় হল। এইটুকু জয়নালের বিয়ে? ওর সঙ্গে নিজেকে বিচার ক'রে আমি একেবারে হাসিতে মাতাল হয়ে গেলুম এই পূবে হাওয়ার মত। মাথায় উঠল তামাক খাওয়া।

কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে যতই বিস্ময়ের ও হাসির হোক, জয়নালের তা নয়। ওর বাপ ভাইসাহেবেরা ওর মত বয়সেই বিয়ে করেছিল।

সুতরাং ও কেন করবে না?

কিন্তন্ আমি কইছি বাপজানেরে যে, মোক্তারি আমি পড়ুম না। এম. এ. পাশ কইরা আমি কইলকাত্তায় বড় চাকরি করুম। আর সাদী···

পাটক্ষেতের হাওয়ার ঝাপটায় ভেসে গেল তার গলা।

বললুম, কি রে?

সে বলল, মধু, তুই যদি কস্, তবে করি।

মহা ভাবনার কথা। এবার আর হাসি ঠাট্টা নয়। দুই বালক বন্ধুতে আমরা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলুম পাটক্ষেতের মধ্যে, দোলায়মান ডিঙ্গিতে।

শেষে ঠিক করলুম, এটা বড় কম সম্মানের কথা নয় যে, এ বয়সে আমি হব একজন বিবাহিতের বন্ধু। বললুম, হঃ কৈরা ফেলা একটা সাদী।

কিন্তন্, বউ যদি ত'র লগে মিলতে না দেয়? জয়নালের চোখে দুশ্চিন্তা।

ক্যান্ দিব না?

ঠোঁট উলটে বলল জয়নাল, কি জানি, বউগুলাইনে নাহি দোস্তি ভাঙ্গায়। তার থেইক্কা ভাল আমার সাদী না করন।

এমন সময় একটা সরগোল ভেসে এল দোলাইগঞ্জ স্টেশনের দিক থেকে। আমরা তাড়াতাড়ি ডিঙ্গি নিয়ে এগিয়ে এলুম।

দেখলুম দুটো নৌকা হাওয়া কেটে এদিকে আসছে এগিয়ে আর স্টেশনের উপরে খুবই ভিড়। অনেকে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে সাঁতার কেটে আসছে এদিকে।

এক মুহূর্ত সেদিকে দেখে ও কান পেতে, চকিতে ডিঙ্গির মুখ পূবে ফিরিয়ে শক্ত হাতে দ্রুত বৈঠায় চাড় দিল জয়নাল।

আমরা একসঙ্গেই বলে উঠলুম, রায়ট!······

মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে ধ্বক ক'রে উঠল। পূবে হাওয়ার ঝাপটায় কে যেন হিসিয়ে উঠল, মৃত্যু!······মনে পড়ল চকিতে, আমি হিন্দু আর ওই

বিলের বুকে যারা ধেয়ে আসছে, মাছ ধরছে, তারা সবাই মুসলমান। এখুনি লগির কয়েক ঘায়ে শেষ ক'রে ঢুকিয়ে দেবে কলমীদামের তলায়।

ফিরে তাকালুম জয়নালের মুখের দিকে। সে মুখ শক্ত, দৃষ্টি নিবদ্ধ আমারই দিকে। কিন্তু কেন?

ধাঁ করে প্রথমে মনে পড়ল, জয়নাল মুসলমান! আমি যেন দেখলুম, তার ঠোঁটের কোণে ছদ্মবেশী আততায়ীর গোপন হাসি।

ডাকলুম তবু, জয়নাল।......

ডাকলুম, কিন্তু শব্দ বেরুল না গলা দিয়ে।

হাওয়া ঠেলে দোলাইগঞ্জ থেকে ভেসে এল মৃত্যুর আর্তনাদ। এল বন্দে মাতরম্ ও আল্লা-হো-আক্‌বর ধ্বনি।

সংশয়ের শেষ সীমায় পৌঁছে আমি প্রায় কেঁদে উঠলুম, জয়নাল, আমি বাড়ীতে যামু।

না।

না? চকিতে মনে পড়ল সেই কুমীরের কথা, যে বাঁদরকে খাওয়ার জন্য ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল জলে বেড়াতে। আমার ঘরবিমুখ মন প্রাণভয়ে হাহাকার করে উঠল বাবা মার কথা মনে ক'রে।

আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম জলে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য।

খেঁকিয়ে উঠল জয়নাল, আরে, করস্ কি?

বাড়ীতে যামু।

পিছে চাইয়া ছাখ্।

চেয়ে দেখি, মানুষের ঝাঁক আসছে এদিকে সাঁতার কেটে বিল তোলপাড় ক'রে। আসছে কয়েকটা নৌকা। তারা তো আমাকে ছাড়বে না!

সোঁ করে একটা ঝোপে ছাওয়া নালার মধ্যে ডিঙ্গি ঢুকিয়ে ঘস্ ক'রে থামিয়ে দিল জয়নাল। নৌকা বেঁধে আমার হাত ধরে লাফিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে একছুটে এসে সে হাজির হল ওদের বাড়ীতে।

ডাকল, বাপজান!

আইছস্, আইছস্‌রে বাপজান! বলতে বলতে বেরিয়ে এল তার বাবা মুখ ভরা গোঁফ দাড়ি নিয়ে।

আইছস্, আইছস্, আমার মাণিক! নোলক দুলিয়ে হুঁকো হাতে ছুটে আসে তার মা।

তার বারো বছরের ভাবী ঘোমটা তুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দরজা ধরে। ইতিমধ্যেই শুনেছে তারা দাঙ্গার কথা।

আমার দিকে চেয়ে দেখবার কারুর অবসর নেই। ত্রাসে ফুঁপিয়ে উঠল জয়নালের আম্মা, আমার মজিদ কেমনে আইব গো—।

মজিদ জয়নালের বড় ভাই। সে কাজ করে টিকাটুলির গ্লাস ফ্যাক্টরিতে।

জয়নালের বাবা বলল, আমি একবার ডিঙ্গিখানা লইয়া দেইখ্যা আহি দোলাইগঞ্জে।

না গো বাপজান্, হেইখানে বড় কাটাকাটি লাগছে। জয়নাল বলে বাপের হাত ধরে। বাইয়ে কারখানার মধ্যে থাকতে পাব'অনে। আইজের রাইতটা থাউক।

একমুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলল তার বাবা, তবে থাউক। কি কও গো মজিদের মা?

যা বোঝ। বলে আম্মা উঠোনেই বসে পড়ে।

দরজা থেকে ঘরের অন্ধকারে মিশে যায় মজিদের বারো বছরের বউ।

তারপর হঠাৎ যেন তাদের সকলের নজরে পড়ে আমাকে। কিন্তু নেই সেই অভ্যর্থনা, স্নেহ-খুশির হাসি।

এ মুসলমান গ্রামের মধ্যে আমি যেন স্বজনহীন, অসহায়, আবদ্ধ হয়েছি শত্রুপুরীতে। আমি পালাতে পারি না, কেঁদে উঠতে পারি না। সংশয়ে যতক্ষণ কাটে, সেটাই যেন আশা।

একবার যেন হেসে উঠতে চাইল জয়নালের বাবা। বলল, জয়নাল, দোস্তরে ত'র ঘরে নিয়া তোল্।

কতদিনই একথাটি শুনেছি, কিন্তু আজকের মত এমন বেসুরো বাজেনি।

আমার বালক মন বার বার মনে মনে গাইল, বুঝি খুন করার জন্য, বুঝি মজিদের প্রাণের জামিন হিসাবে আমাকে তারা তুলে রাখল ঘরে।

তারপর রাত্রি গেল, দিন গেল। জ'লো হাওয়ায় ঝড় বয়ে গেল বেতবনের উপর দিয়ে, কলাবাগানে ঢেউ দিয়ে, ছিটে বেড়ায় ঝাপটা খেয়ে।

আমি বন্ধ ঘরে, ভয়ে আধখানা হয়ে এক কোণে বসে বসে করছি বুঝি মৃত্যুরই প্রতীক্ষা, হাওয়ায় শুনছি তারই শাসানি।

আজ সকালে দেখি জয়নালকে তার বাপজান কি যেন বলল আমার দিকে ইশারা ক'রে। সেই থেকে ওরা আমাকে শিকল বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

বললুম, জয়নাল শিকল দ্যাছ্ ক্যান ?

বলল, তুই যদি পালাইয়া যাস্ ?

ওরা আমাকে পালাতেও দিবে না। জয়নাল আমার কাছে এসে বসেও না দু'দণ্ড।

তবু ওরা আমাকে খেতে দেয়। কিন্তু কে খাবে ?

আম্মা বলে, খাও মানিক, হাঙ্গাম থাম্‌লে যাইও বাপ মা'র কাছে।

মনে হল ওটা মিঠে গলার ছলনা। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। কিন্তু আড়াল থেকে দেখছি, ওরাও খায় না, শুধু ভাত নিয়েই বসে। দেখছি মজিদের কলাবউ জামতলায় দাঁড়িয়ে, ঘোমটা সরিয়ে ব্যাকুল চোখে কি যেন দেখে পশ্চিম মুখে। দেখছি জয়নালের বাপজানের শরীরটা ফুলে ফুলে ওঠে নামাজে ব'সে।

এ গ্রামের অনেকেই শাক তরকারী বেচতে যায় সূত্রাপুর বাজারে। তারা অনেকেই আসেনি ফিরে, কারুর বা এসেছে মৃত্যুর খবর।

দিনে রাত্রে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে কান্না। কখনো শোনা যায় জেহাদী কোলাহল, আচমকা আকাশ লাল হ'য়ে ওঠে এদিকে ওদিকে।

আমার যেন দিনরাতেরও হিসাব নেই।

প্রায় দিন চারেক বাদে হঠাৎ জয়নাল আমার কাছে এল। উস্‌কোখুসকো

চুল, কোল-বসা চোখ, শুকনো মুখ। বলল, মধু, আমি যামু টিকাটুলি ভাইজানের খোঁজে। ফিরা আহি, তারপরে দিয়া আমু বাড়ীতে।

তারপরে হঠাৎ কলসী থেকে মুঠোভ'রে তুলে আনল আমচুর। বলল, নে, খা। তোর মজার আমচুর।

বলে সে বেরিয়ে গেল। আমার মনে হল এ যেন কত যুগের পুরনো কথা। ছুঁড়ে ফেলে দিলুম আমচুর আর হু হু ক'রে আমার চোখ ছাপিয়ে জল এল। আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

তারপর কয়েকদিন বাদে আমি ঘরে থেকেও বুঝলাম, অবস্থা অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু জয়নাল বা মজিদ কেউ-ই আসেনি।

ভাবছি, এমন সময় সবাই চেঁচিয়ে উঠল, আইছে, মজিদ আইছে। ঘর থেকে দেখলুম, একটা ছোট পুঁটলি বগলে মজিদ এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে। সারা মুখে তার গোঁফদাড়ি, বসা চোখে যেন অর্থহীন দৃষ্টি। ঝ'ড়ো হাওয়ায় উড়ছে রুক্ষ চুল।

আইছস্ সোণা, মাণিক, আইছস। বাবা মা জড়িয়ে ধরে মজিদকে।

বারো বছরের কলাবউটি ঘোমটা ঢাকতে ভুলে যায় তার হাসি মুখে।

মণিরে আমার খোদা ফিরাইয়া দিছে। আম্মা বলল, আমাগো জয়নাল আইছে না ?

পুঁটলি থেকে রক্তমাখা জামা আর লুঙ্গি বের করে ফুঁপিয়ে উঠল মজিদ, জয়নালরে মাইরা ফেলাইছে।

ডুকরে উঠল সবাই, মাইরা ফেলাইছে ?

মজিদ বসে প'ড়ে মাটীতে মুখ চেপে হা হা ক'রে কেঁদে উঠল, হ কারফিউ এলাকা দিয়া যাওনের সময় তারে মিলিটারিতে গুলী কইরা মারছে। আমার কাছে যাওনের সময় !......

কারুর কান্না আমার কানে গেল না। মনে হয় দুরন্ত হাওয়ার ঝাপটাই যেন দুনিয়াকে উল্টে দেবে।

মেঝেতে তখনো ছড়িয়েছিল আমার ছুঁড়ে ফেলা আমচুর, জয়নাল দিয়েছিল।

আমাকে ফিরিয়ে দিতে চলেছে জয়নালের বাপজান ডিঙ্গিতে করে।

আজ বিল শান্ত! থেকে থেকে হঠাৎ হাওয়ায় শিউরে উঠেছে কলমীদাম আর শাপ্‌লা ফুল, টলটলে জলে লুকোচুরি খেলছে ট্যাংরাপুঁটি, স্তব্ধ পাটক্ষেত। পাখী একটা ডাকছে, ওহো·········ওহো·········সে শব্দ মিশে যাচ্ছে শূন্য আকাশের বুকে।

সন্দেহে প্রাণের ভয়ে আমি কারুকে ছোট করেছি কি না করেছি, কি ভাল কি মন্দ, সে বিচারের অবসর ছিল না আমার মনে। কেবল থেকে থেকে কুড়িয়ে আনা সেই আমচুর ভরা মুঠো বুকে চেপে, আমার বালকের বোবা মন গুমরে গুমরে উঠল আর খালি মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, জয়নাল·········জয়নাল!

বাপজান শুধু বলল, কাইন্দ নারে সোণা!·········

আবর্ত

নাই নাই আর নাই।

ক্লান্ত বাদশা' হুঁকোটি হাতে নিয়ে তিনটি কথা জিজ্ঞেস করেছে, আর তিনটি জবাব দিয়েছে জোবেদা—নাই।

চার ক্রোশ পথ হেঁটে এসে, হাত পা' না ধুয়ে শুষ্ক কণ্ঠনালীটিকে একটু ভিজিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়েছে—তাই একেবারে সোজা পায়ের ধূলোমাটি নিয়ে দাওয়ায় উঠে এসে হুঁকো নিয়ে বসেছে সে। তামাকের ডিবা হাত্ড়ে তামাক না পেয়ে জিজ্ঞেস করেছে, তামুক নাই?

অপরাধীর মত জবাব দিয়েছে জোবেদা—নাই।

—পাতা আছে?

—নাই।

—রাব?

—নাই।

নাই! ক্লান্ত মস্তিষ্কটায় এই নাই বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ক্রোধে যেন চৌচির হয়ে গেল। দপ্ ক'রে আগুন জ্বলে উঠল যেন সারাটা গায়ে। ঠাস্ ক'রে হুঁকোটাকে দাওয়ায় আছড়ে ভেঙে ফেলল সে। খোলের পীতাভ জল গড়িয়ে পড়ল দাওয়া থেকে উঠানে।

—নাই! ভীষণ ক্রোধে নিজেকে সে নিজেই যেন শাসিয়ে গর্জে উঠল। ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে শিকা'র উপর থেকে হাঁড়ি কলসী যা পেল—ক্ষ্যাপা পাগলের মত ভেঙে দিল তছ্নছ্ ক'রে। ঠাস্ ঠাস্ ক'রে নিজের গালে মুখে ঘুষিয়ে চড়িয়ে হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে ক্যাঁৎ করে একটা লাথি কষিয়ে দিল জোবেদার

পাঁজরে। —কি ছ্যাখস্ তুই হারামজাদি ? চাইয়া চাইয়া ছ্যাখস্ কি ? বাইর হ, বাইর্ হইয়া যা' আমার সামনের থেইক্যা !

এমনিতেই বাদশার উগ্র মতি গতি দেখে জোবেদা আতঙ্কে থর্ থর্ ক'রে কাঁপছিল। তারপর হঠাৎ লাথিটা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল চৌকাঠের উপর।

এমন সময় বাদশা'র ছেলে মঙ্গল খেলে ফিরে বাড়ীতে ঢুকে ব্যাপার দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মনে হ'ল বাদশা' বুঝি তার উপরও ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তা' না করে সে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। দেখতে পেয়ে জোবেদা নতুন আতঙ্কে আবার ডুকরে উঠল, ও মঙ্গল, ছ্যাখ মানু'ডা যায় কুন্‌ঠাঁই। নিজের পরানডারে না শেষ করে।

না, প্রাণ দেওয়ার কথা মনে আসেনি বাদশা'র। সে জনশূন্য পীরের দরগার পিছনে প্রকাণ্ড হিজল গাছটার প্রশস্ত শিকড়টার উপর ভেঙে পড়ল।—হায় খোদা !

তামাক বা তামাকের পাতা নেই, শুধ্ এই কারণেই বাদশা' আজ এমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেনি। তার আজ কিছু নেই, রিক্ত ক'রে দিয়েছে একেবারে—সমস্ত বুকটাকে খালি ক'রে দিয়েছে।

গাঙের ধারে বিঘা চারেক যে ঢালু জমিটুকু তার সারা বুক জুড়ে যুগিয়ে রেখেছিল এত আশা উৎসাহ, সেটুকু আকণ্ঠ দেনার দায়ে হাতছাড়া হয়ে গেছে। কেউ কোনদিন ভাবতে পারেনি ওই জমিতে বাদশা' চাষ করতে পারবে। ঢালু জমির উপর লাঙ্গল নিয়ে উঠানামা করা সে বড় চারটিখানি কথা নয়, আর বলদ সে বলদই, মেশিন নয় যে লেজ মোচড়ালেই সে ঢালু জমির বুক চিরে লাঙ্গল নিয়ে ওঠানামা করবে।

তবে হ' বাদশা' হল খাটিয়ে জোয়ান মরদ। চার সাল আগে বিষম জ্বর থেকে আরোগ্যলাভের পর—সাক্ষাৎ হজরৎ-পীর খালিকুজ্জমানের স্বপ্নে-পাওয়া মাদুলী আজও আছে তার চওড়া গর্দানাটায় বাঁধা—সেই যে এসেছিল স্বাস্থ্যের জোয়ার আজও সেই জোয়ারে ভাটা পড়েনি। মাদুলিধোয়া জল খেয়ে একটা প্রচণ্ড

গোঁ ধরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই পাহাড়ের মত ঢালু জমির বুকে। এই উপেক্ষিত ঢালু ঘাসবনের বুকে সে ফুটিয়ে তুলবে বেহেস্তের সৌন্দর্য, সমতল ভূমির সমস্ত গরিমাকে আত্মসাৎ করবে সবুজ সমুদ্রের ঢেউ তুলে।

তুলেছিল, সবুজ সমুদ্রের ঢেউ উঠেছিল সেই ঢালু জমির বুকে। সমতলভূমির আয়েসী অহঙ্কারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল সে।

কিন্তু তখন তার বড় ভাই সোলেমান হতাশায় ভয়ে চলে গিয়েছিল—শহরে। কারখানায় কাজ করতে। সে ভয় পেয়েছিল, অনাহার দুর্দশার, ঢালু আগাছাভরা জমি আশার বদলে দুরাশাই এনে দিয়েছিল বেশী। নিজের বিবিকে শুদ্ধ সে নিয়ে গিয়েছিল, বাদশা'র ভাবীসাহেবাকে।

বাদশা' যায়নি। সে হল চাষী, যাকে বলে খাঁটী চাষী। স্বাধীন গ্রামিন্ আভিজাত্য ছিল তার মনে। গোলামীকে সে ঘৃণা করে। কারখানায় কাজ করতে যাওয়াকে সে মনে করে অপমান। ভীরু সোলোমান তাই যে জমি দেখে ভয় পেয়েছিল, হতাশায় চলে গিয়েছিল কারখানায় কাজ করতে, বাদশা' সেই জমিতেই রক্তের বিনিময়ে ফলিয়েছিল সোনা।

বাদশা'র পীড়াপীড়িতে সোলেমান একবার এসেছিল ছোট ভাইয়ের কেরামতি হিম্মৎ দেখতে। হাঁ, তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিল তাকে বাদশা'। বাদশা'র প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধায়, সম্মানে—নিজেকে তার বড় দুর্বল, লজ্জিত মনে হয়েছিল, সে যেন বাদশা'র ছোট ভাই।

কিন্তু সোলেমানও খুব দুঃখে ছিল না। টাকার মুখ তো দেখেছে সে, খাওয়া পরারও অভাব ছিল না খুব। বাদশা'হ অবশ্য একটু বিস্মিত হয়েছিল ভাইসাহেবের ভদ্রলোকি পোশাক আর মেজাজ দেখে। তবে তার মধ্যে শ্রদ্ধা ছিল না, ছিল একটা চাষাড়ে বিস্ময়। সেই বিস্ময়টুকুও শেষ পর্যন্ত বক্র হাসির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল। গোলামির আভিজাত্য!

কিন্তু ইতিমধ্যে দেনার ছোট গর্তটা সুদে আসলে ভিতরে ভিতরে কত দিকে যে ছড়িয়ে পড়েছিল এটা সে টের পায়নি। টের পেল আজ সকালে যখন জোতদার মামুদ মিয়া তাকে ডেকে বলল, ওই ঢালু জমিটাও তার খাসে চলে গেল।

নতুন উৎসাহে নতুন বলদ কিনেছিল তখন বাদশা দেনা ক'রে। বীজ ধান নিয়েছে কয়েকটা সাল। সব মিলে স্থদে আসলে যা' দাঁড়িয়েছে বাদশা'কে ভিটেটুকু পর্যন্ত বাঁধা দিতে হবে শেষে।

সকালবেলা একথা শুনে সে গিয়েছিল জোতদার মহিন্ ঠাকুরের কাছে। ভাগে চাষ করবে সে মহিন্‌ঠাকুরের জমিতে। মামুদের জমিতেও সে ভাগে কাজ করতে পারত, কিন্তু মামুদের প্রতি একটা বিজাতীয় ক্রোধে সে তার কাছে যায়নি। মামুদ তাকে একটু খাতির অবধি করেনি। স্পষ্টভাবে সোজা জানিয়ে দিয়েছে, ওই জমিটাতে আর নাঙ্গল ঢুকাইও না বাদশা'। তোমার কর্জর বহর বড় বেশী। বলদ দুইটা লইয়া আইস, কিস্তি শোধের টাকাটা লেইখা লইমু। টিপসই দিয়া যাইও। আর এই বছরডা গেলে তোমার বাপের ভিডাও আমার খাসে আইব!

একটু চুপ করে থেকে পরমুহূর্তেই পরম গাম্ভীর্যে সে বলেছে, আমার ক্ষেত-মজুররা থাকব হেই ভিডায়। ইচ্ছা করলে তুমিও থাকতে পার, বিবি ছাওয়াল লইয়া একলাই থাকতে পার। বাপের ভিডা আর ছাড়তে হয় না।

অর্থাৎ মামুদের ক্ষেত-মজুর হবে বাদশা'।

ভাইবা দেহি—এই বলে সোজা সে চলে গিয়েছিল হাটে মহিন্‌ঠাকুরের কাছে। কিন্তু সেখানকার একটা বিরাট রহস্য—ভাগে দিলে না জমি মহিন ঠাকুর। কারণ কিছু বললে না, শুধু উপদেশ দিয়ে দিলে বাদশা'কে, মামুদের কাছে যাও, সে জমি ভাগে দিবে। তোমাদের জাতের লোক, বড় মানুষ, তার কাছে যাও।

সেই থেকে তার শূন্য বুকটা হাহাকার করছে, নাই, নাই, কিছু নাই। আর সেই নাইয়ের প্রতিধ্বনিটা যখন এল জোবেদার কাছ থেকে তখন তার বোবা লক্ষ্যহীন আক্রোশটা ফেটে পড়ল এমন ভয়ঙ্করভাবে।

বাদশা' মুখ তুলল, দৃষ্টিটা তুলে ধরল দিগন্তবিসারী তেপান্তরে।

নিস্তব্ধ গোধূলি। পথে প্রান্তরে মানুষের সাড়া প্রায় নেই বললেই চলে। আমনের কাজ শুরু করবার সময় হয়েছে কিন্তু কাজ আরম্ভ হয়নি এখনো,

তাই তেপান্তর জুড়ে মানুষ চোখে পড়ে না একটাও। সারা মাঠই প্রায় মামুদের খাস। সে হুকুম না দিলে, বীজধান না দিলে কাজ শুরু হবে না। সেই অপেক্ষাতেই আছে সবাই।

তেপান্তর জুড়ে চোখে পড়ে শুধু রিক্ত মাঠ। খোঁচা খোঁচা আউস ফসলের অবশিষ্টাংশ ছুঁচের মত আকাশমুখী হয়ে আছে। খাপছাড়াভাবে এখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে আগাছা। জলো ঘাস আর কাশবনের ঘন আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ছে তেপান্তরের বুক জুড়ে।

গুচ্ছ গুচ্ছ দীর্ঘ শাদা কাশফুল ফুটেছে, মাথা হেলিয়ে দুলছে হাওয়ায়। বাদশা'র মনে হয় সন্ধ্যার ধূসর আলোয় জোবেদার মত শত শত মেয়ে, এই গাঁয়ের মেয়েরা শাদা বোরখা পরে—রিক্ত মাঠ জুড়ে মাথা নেড়ে চলেছে—নাই নাই নাই! মনে হয় নমশূদ্রদের ঝিউড়ি বউড়িরা মাথায় ঘোমটা টেনে তেপান্তর জুড়ে সারি সারি মাথা দুলিয়ে চলেছে—নাই নাই নাই। কাশ আর জলো ঘাসবনের এই বিস্তৃত সমারোহ কি মামুদের চোখে পড়ে না!

হঠাৎ চমকে উঠল বাদশা' সামনের উই পোকার বিরাট ঢিবিটার পিছনে মানুষের একটা মাথা দেখে। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে। কেমন ছম্ ছম্ করে উঠল বাদশা'র গা'টা।—কেডা ওইখানে? উঠে দাঁড়াল সে।

ঢিবিটার পিছন থেকে উঁকি মারে মঙ্গলের ভীত অপরাধী মুখটা।

—কেডা, মঙ্গল নি?

—হ।

ছাওয়ালটার ভীত সন্ত্রস্ত কচি মুখখানি দেখে অবোধ-বেদনায় টনটনিয়ে উঠে বাদশার বুকটা। আফ্‌সোসে মনটা পুড়তে থাকে। কিছুক্ষণ আগের চণ্ডালিপনার কথা মনে হতেই তার অন্তরাত্মা যেন ফুঁপিয়ে উঠতে চাইল! তার ছাওয়ালের মা মাগীটার পাঁজরটাকে ভেঙে দিয়েছে। বুকটা ভেঙে গেছে ছাওয়ালটার। বাপজান নয়, বাঘা কুত্তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ভীরু শেয়ালের বাচ্চা। হায় বাদশা'র কিসমৎ, হায় বিবি ছাওয়ালের তক্‌দির্!

—কাছে আয় মঙ্গল!—গলা শুনে মনে হয় সত্যিই বুঝি ফুঁপিয়ে উঠবে সে।

মঙ্গল শঙ্কিত মুরগীর বাচ্চার মত পা ফেলে কাছে আসে। একটু হেসে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে বাদশা বুকের কাছে তাকে টেনে নিয়ে বলে : এমুন বাহাইরা জামাডা তরে কে দিছে রে মঙ্গল ?

বাপজানের এ স্মৃতিহীনতা আর হাসি দেখে একটু সাহস পায় মঙ্গল। বলে, তোমার মনে নাই, বড় চাচী গেল ঈদে পাঠাইয়া দিছিল আমারে ?

মনে পড়ে বাদশার সোলেমানের বিবি—তার ভাবীসাহেবার কথা। শহরে গিয়ে সরমের মাথা খেয়েছে সে। বোরখার বালাই প্রায় ত্যাগ করেছে সোলেমানের বিবি। চাষী বউয়ের মত আর ঘোমটা টেনে কথা বলে না। দ্বিধাবোধ করে না একটা পর-পুরুষের কথার জবাব দিতে। বড় বেহায়া তার ভাবীসাহেবা, খানদানের মাথা সে নীচু ক'রে দিয়েছে। কথা বলে হেসে ঢুলে—হড়বড় করে। কেমন একটা অপরিচয়ের গণ্ডী যেন খাড়া হয়ে ওঠে বাদশার চোখে। অচেনা মনে হয় ভাবীসাহেবাকে—তার চলন বলনকে। মনে পড়ে কাজীর পাঁচালী : "দাঁত ছাখাইয়া হাসে নারী ঢুপঢুপাইয়া চলে'—।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে জোবেদার কথা। সরমে ভরপুর। বাদশার উঠানের রোদটুকু ছাড়া যার গায়ে আর রোদ লাগে না, ছ্যাঁচা বেড়ার সঙ্কীর্ণ ফুটো দিয়ে যে পর্যবেক্ষণ করে বাইরের বিরাট পৃথিবীকে।

তবে বেহায়া হলেও ভাবীসাহেবা বড়ই স্নেহশীলা। ভালবাসে সে সবাইকে। দিলটা বেশ খোলসা। বাদশা' আর জোবেদাকে সে দেখে ভাই-বহিনের মত। হিংসা নেই মানুষটার। মঙ্গলের তো কথাই নেই। আবাগীর ছাওয়াল নেই, মঙ্গলকেই সে নিজের ছাওয়ালের মত দেখে। যখনকার যে, খাবার থেকে শুরু করে—জামা টুপি, মায় জুতোটি পর্যন্ত, মঙ্গলের জন্য বারোমাস পাঠাবে। মঙ্গলের ব্যামো হলে উপোস দিয়ে পড়ে থাকে সে সেখানে। সোলেমান তখন ঘনঘন চিঠি লেখে ; তোমার ভাবীসাহেবা ভাত পানি ত্যাজিয়াছে।—

এই মুহূর্তে খুব খারাপ মনে হয় না ভাইসাহেবের জীবনটা বাদশা'র কাছে। তার মত এমন এক মুহূর্তে রিক্ত হয়ে যাবার ভয় নেই সোলেমানের। মনে পড়ে সেই মোটা—আসমান ছোঁয়া চিমনিটা—মুখ থেকে যার অনর্গল ধোঁয়া বেরোয়—

কালো জমাট ধোঁয়া। তার নীচে সেই বিরাট ঘরটায় কাজ করে তার ভাইসাহেব। হপ্তায় হপ্তায় টাকা নিয়ে আসে—নিয়ে এসে দেয় ভাবীসাহেবার হাতে। অভাব নেই ছোট্ট সংসারটায়। আসে খায়, খায় আসে।

তার চিন্তায় বাধা দিয়ে ডাকল মঙ্গল ; আম্মা বড় কান্‌তে লইছে, বাড়ী চল বাপজান্।

—হ, চল্! একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে বাদশার। চলতে চলতে হঠাৎ বলে তর্ বড় চাচীর কাছে যাবি রে মঙ্গল্?

মঙ্গল বিস্মিত হয়। নানান্ ঘটনা ও কথার মধ্য দিয়ে সেও জানত চাচা-চাচীর উপর বাপজানের বড় গোসা। তাই উল্লসিত জবাব একটা থাক হঠাৎ কিছু বলতে পারল না সে, সন্ধ্যার অন্ধকারে বাপজানের চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নিস্তব্ধ বাড়ীটার বেড়া ঠেলে ঢুকে দাওয়ায় উঠে বসল বাদশা'। মঙ্গল ভিতরে গেল তার আম্মার কাছে। ফেলাছড়া জিনিসগুলো চোখে পড়ে না একটাও। যেমন লেপা-পোঁছা তেমনি। অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে অন্ধকার দাওয়ায় একলা চুপ করে বসেই থাকে সে।

একটু পরে মঙ্গল এসে একটা আস্ত হুঁকা বাড়িয়ে ধরে বাপজানের সামনে। হুঁকার ডগায় টাটকা তামাক ভরা ধূমায়িত কল্‌কে। ঘরের দরজার আড়ালে কাঁচের চুড়ির ঠুন্ ঠুন্ শব্দ আসে তার কানে।

ব্যথিত লজ্জিত বাদশা হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিল। অন্যমনস্কের মত দু'একটা টান দিয়ে, একটু কেশে ডাকল, মঙ্গলের মা আছনি?

শান্ত জবাব আসে দরজার আড়াল থেকে—জী।

—এটু এদিকে আইও।

জোবেদা এসে দাঁড়াল অন্ধকার দাওয়ার একপাশে একটু দূরে। মুখ দেখা যায় না। শুধু তার হাতের কাচের রঙবেরঙের চুড়িগুলো সামান্য জ্বল্ জ্বল্ করে। সেদিকে না চেয়ে বাদশা' বলে, গাঙ্গ কিনারের জমিডা—মামুদ ছাইড়ল না।

জীবনে এই প্রথম বাদশা' বিবির কাছে সাংসারিক আলোচনা করতে বসল।

ছনিয়ার সমস্ত ভাবনা মরদের ; মাগীরা রাঁধবে, বিয়োবে, মরদের পরিচর্যা করবে, এটাই সে চিরকাল ভেবে এসেছে। বললে ; উপায় না দেইখা গেছিলাম মহিন-ঠাকুরের কাছে। কিন্তুক ভাগে দিব না হেই জমি।

জোবেদা স্তব্ধ নিরুত্তর। দু'একটা জোনাকি জ্বলে উঠছে বাইরে অন্ধকারের বুকে।

—এই ভিটাও আর বেশীদিন নাই, বোঝলানি মঙ্গনের মা ? মুখ তুলে তাকাল সে জোবেদার ঝাপসা মুখের দিকে।

তারপর খানিকক্ষণ ঘন ঘন হুঁকোয় টান দেওয়ার পর হঠাৎ সে বলে, সরম কম বটে, তবু ভাবীসাহেবা আমাগোরে খুবই পেয়ার করে। কোন পরব বাদ যায় না ; তোমার লেইগা শাড়ী—মঙ্গনের জামা—কত কি দেয়। মঙ্গন তো তার নিজের ছাওয়ালের লাহান—না ?

জোবেদার কাছ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ আসে—হাঁ।

—ভাই সাহেবও তাই। মানু'ডা খুবই ভাল। পোড়া পেটের লেইগা মানু'তে কিনা করে, ভাই সাহেব তো কারখানায় কাম করে। খাইটা খায়। তা ছাড়া, সুখেই আছে তারা। অষ্ট পহর অভাব নাই।...

একটু চুপ করে থেকে হুঁকোটা রেখে হঠাৎ বেশ জোর দিয়েই বলে সে, আমিও ভাইসাহেবের কাছে যামু, কাম করুম কারখানায়, হ ! গুমোট ধোঁয়ায় যেন আটকে এল তার গলা।

—না না। এতক্ষণে প্রায় চাপা আর্তনাদ করে উঠল জোবেদা।—আপনে পারবেন না কারখানায় কাম করতে।

—পারুম। বাধা দিয়ে বলে ওঠে বাদশা'।

মানুষটা আজ একি কথা বলছে ! জোবেদা তবু বলে ; হেই ড্যাকরাডার (মামুদের) কাছেই যান। তার কাছে—

—না। আবার রুক্ষ হয়ে ওঠে বাদশা'র স্বর। দুঃখু নাই, চিন্তা নাই, আনে খায়, আমিও ভাইসাহেবের মত রোজগার করুম। ঝঞ্চাটের কাম কি ? বাপ মায়ের মত ভাই ভাবীসাহেব, তাগো কাছেই যামু। ইজ্জৎ বাঁচব, বোঝলা, তোমারও ইজ্জৎ বাঁচব। মঙ্গনডা দুইডা ভাল মন্দ খাইতে পাইব।

নির্বাপিত হুঁকোটা তুলে নিল সে আবার। পাতালপুরী থেকে যেন অন্ধকার পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে বাদশা'র গলা, তুমি বোঝনা মঙ্গনের মা,—ক্ষেত মজুর আর ক্যাঙ্গালীতে তফাৎটা কি? হেযে মামুদের ক্ষেত মজুর, বিলাই কুত্তার লাহান, জোতদারের পায়ের তলায় পইড়া বারমাস রোজা পালুম! ভিডা নাই, জমি নাই, বিলাই কুত্তা না তো কি? না না না, তার থেইকা ভাইসাহেবের মত রোজগার ভাল!

হুঁকো রেখে জোবেদার কাছে এসে দাঁড়ায় সে। আজই রাইত বিহানে বাইর হমু। জাহাজ ছাড়তে হেই বেলা একডা, শেষ রাইতে বাইর হইলে বেলা বারোটা লাগাৎ ঘাটে পৌছামু, বোঝলা?

জোবেদার গলা দিয়ে কথা ফোটে না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল সে।

বাদশা' নেমে গোয়ালের দরজাটা খোলে। কইরে সোরাব্ রুস্তম! বলদ দুটোর নাম রেখেছিল সে সোরাব-রুস্তম। তেজী বলদ, ঢালু জমির বুক চষেছিল ওরা! জমিদার বাড়ীর জোয়ান ঘোড়ার মত প্রকাণ্ড বলদ, ওপারের হাট থেকে কিনে নিয়ে এসেছিল পছন্দ করে। লড়ায়ে চেহারা দেখে সে ওই নাম রেখেছিল। মঙ্গনের ইতিহাস বইয়ে সেই দুই বীরের নাম শুনেছিল সে, বাপ ব্যাটার বীরত্বের কাহিনী। সেই মরদ দুটোর নামের পিছনে যে রোমান্স ছিল, সেই রোমান্স তার জেগে উঠেছিল এই তেজী বলদ দুটোকে দেখে।

সোরাব-রুস্তম বেরিয়ে এল।

—চল্‌রে। দিয়া আহি ত'গো কসাইডার কাছে, ত'গো নসিব বান্দা তার হাতে!

জোবেদা লম্ফটা নিয়ে এসে দাঁড়াল। নির্বোধ বলদ দুটো চারটে ডাগর চোখ তুলে ধরল মনিবের দিকে। ভাবল বোধ হয় রাত্রে অন্ধকারে গোয়ালের বাইরে, জীবনে তাদের এ ব্যতিক্রম কেন?

—দিয়া আহি মঙ্গনের মা! চল্‌রে! অন্ধকারে বলদ দুটোকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বাদশা'।

সারা রাত ধরে এটা সেটা নানান টুকিটাকি বস্তা বের করেছে জোবেদা। সমস্ত বেঁধে ছেঁদে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছে সে। হঠাৎ লাথির আঘাত খাওয়া পাঁজরটার মৃদু স্পর্শে চম্‌কে জেগে উঠল সে।—কেডা?

—আমি, বাদশা'র নরম গলা কেঁপে উঠল একটু। সময় হইল মঙ্গনের মা। উঠ বাইর হইতে হইব।

মঙ্গনের গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিল সে। ওঠ্‌রে মঙ্গন্‌ ওঠ ওঠ।

গোটা তিনেক বোঁচকা, একটা মাদুর আর একটা হ্যারিকেন। বাদশা'র সংসার!

বাদশা' বলে, বোরখাটা অখন থাউক। রাইত পোহাইলে রাস্তায় পইরা লইও। বলে সে একটা বোঁচকা মাথায় আর একটা হাতে নেয়। বগলে নেয় মাদুরটা। আর একটা বোঁচকা ওঠে জোবেদার কাঁধে। হ্যারিকেনটা নেয় মঙ্গন।

দরজায় শিকল তুলে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই জোবেদার চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে এল চোখ ছাপানো জলে।

বাদশা'র ঠোঁট দুটো থর্‌ থর্‌ করে কেঁপে উঠল উঠানে দাঁড়িয়ে। মনে মনে বলল সে, আবার আইমু। কারখানার খাটুনির পয়সা দিয়া আবার ভিডা ছাড়ামু, জমি ছাড়ামু, আমার গাঙ্গ কিনারের জমিডা।

বাইরে তখনো অন্ধকার। আসন্ন শরৎকালের মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আকাশে শুকতারাটা জ্বলছে দপ্‌ দপ্‌ করে। তিনটি মানুষের ছোট একটি দল ছায়ার মত এগিয়ে চলল—বর্ষার জলে ডোবা সর্পিল পথের উপর দিয়ে। গাঙ্গের কিনার দিয়ে নরম ঢালু জমির বুকে পায়ের গভীর ছাপ রেখে ছায়া তিনটি এগিয়ে চলল জাহাজঘাটের দিকে। আগে বাদশা', তারপর মঙ্গন, পিছনে জোবেদা।

একটুকু পা চালাইয়া আইও গো মঙ্গনের মা। জাহাজ না ফেল হয়। আঁধার শেষ হওয়ার আগেই পরিচিত তল্লাট ছাড়িয়ে যেতে চায় বাদশা'।

বেলা বারোটার আগেই তারা পৌঁছয় জাহাজঘাটে। ইতিমধ্যে পথে জোবেদার গায়ে বোরখা উঠেছে। গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে সে। টিকিট ঘরের একটু দূরে নিরালা জায়গায় বোঁচকা নামিয়ে বসে তারা। বাদশা' টিকিট আর জাহাজের খবর নিতে যায়।

একটা পুরনো মালসা আর চিঁড়ে বের করল জোবেদা বোঁচকা খুলে। মঙ্গনের ক্ষিদে পেয়েছে, ওই মানুষটারই কি আর কম ক্ষিদেটা পেয়েছে! মালসায় চিঁড়ে ঢালতে ঢালতে মুখের ঢাকনাটা খুলে সে বাদশা'র দিকে দেখে। পা টেনে টেনে চলেছে বাদশা'।

—মঙ্গন ঘটিতে কইরা খানিক পানি লইয়া আয় তো বাপ্। মঙ্গনের দিকে একটা ঘটি বাড়িয়ে দিল জোবেদা।

খানিকক্ষণ বাদে বাদশা' ফিরে এল। হাত' পা' ছড়িয়ে বসে পড়ে বলল, আর বেশী দেরী নাই মঙ্গনের মা, ঘন্টাখানিকের মধ্যেই নাকি জাহাজ ভিড়ব।

মঙ্গন জল নিয়ে আসতে সবাই শুক্‌নো চিঁড়ে আর গুড় নিয়ে বসে খেতে। জোবেদা বাদশা'কে আড়াল করে নদীর দিকে মুখ করে বসে।

নদীতে অসংখ্য জেলেদের নৌকা ঘুরছে। কোনটার পাল গুটনো, কোনটার ছাড়া। ইলিশ মাছের মরশুম এটা। তাই নৌকাগুলি জাহাজঘাট আর ওপারের কালো একটা রেখার মত ধূ ধূ করা বহু বিস্তৃত চালার দিকে যাতায়াত করছে।

জলো হাওয়া এলোমেলো হয়ে ঘুরে বেড়ায় বালুমাটির উপর দিয়ে। সেই হাওয়ার গায়ে পাখা ঝাপটা দেয় ওই নৌকাগুলোর মত অসংখ্য গাঙচিল।

জোবেদার বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে উথালি পাথালি করে ওঠে ওই গাঙের বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলোর মত। মনটা এলোমেলো হয়ে যায়, এলোমেলো হাওয়ায়। চোয়াল দুটো আনমনে নাড়তে নাড়তে এক সময় হঠাৎ চমকে উঠল সে একটা শব্দ শুনে।

—আইতেছে। বাদশা' উঠে দাঁড়াল। জাহাজ আইতেছে গো মঙ্গনের মা। হু—ই যে, বাঁশী শোনা যায়। লও, লও সব বাইন্দা ছাইন্দা লও।

খোলা বোঁচকাটা আবার বাঁধতে আরম্ভ করে জোবেদা। মঙ্গনও কপালে হাত দিয়ে দূরের দিকে তাকায়। হ, কি যেন একটা আসছে বড় গাঙের ঢেউ কেটে কেটে।

এতক্ষণে যাত্রীতে ভরে উঠেছে জাহাজঘাটের বালুময় প্রাঙ্গণ। বাক্স বোঁচকায় ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি। দু'একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয় বাদশা'র। জিজ্ঞেস করে, কুনঠাঁই গো বাদশা' মিয়া।

—ভাই সাহেবের কাছে। আর বেশী কিছু বলে না সে। দুঃখ ঘুচুক, পয়সা কড়ি হোক, ভিটা জমি খালাস হোক, তারপর সে অনেক কথা বলবে সবাইকে। সুখের সময় অতীত দুঃখের কথা বলতে ভাল লাগে।

জাহাজ এসে ভিড়ল। ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

বাদশা' বোঁচকা তুলে নিল মাথায় হাতে। জোবেদাও নিল।

—ও মঙ্গন, বাদশা' ডাকে। তুই একটা হাত ধর আমার, আর তর মায়ের আঁচলটা ধর এক হাতে। ছাড়িস্ না ব্যান! আমার লাগৎ আইও গো মঙ্গনের মা।'……

আহঃ! দু' এক পা এগোতে না এগোতেই পেছন থেকে ডাক পড়ে, অ' বাদশা' মিয়া।

—কেডা?—না ফিরেই বাদশা' বিলম্বিত কণ্ঠে হাঁকে।

জবাব দেয় মঙ্গন—আমাগো পিয়ন চাচা!

—আইতে ক' তারে।

—আইতেছে।

পিয়ন কাছে এল। জিজ্ঞেস করল, কই চললা?

—শহরে, ভাইজানের কাছে।

—অ! কাইলের ডাক আইতে বড় দেরী হইছে, তাই যাই নাই। আইজ্ যাইতে ছিলাম তোমা'গো ওদিকেই, খানকয়েক চিডি আছে ওদিককার। তোমারও একখান্ চিডি আছে, লইয়া যাও! একটা পোষ্টকার্ড বাড়িয়ে ধরে সে বাদশা'র দিকে।

হ? মনটা অস্বস্তিতে ভরে ওঠে বাদশা'র। বলে, অখন আর সময় নাই! একটুক্ তাড়াতাড়ি পইড়া দেও তো ভাই--কি লেখেছে, কেডা লেখছে?

জোবেদা বোরখার আড়ালে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

পিয়ন পড়ে, লেখতেছে তোমার ভাইসাহেব সোলেমান, বোঝলানি? লেখছে ঃ—দোয়াবরেষু, বহুৎ বহুৎ দোয়া পর আশা করি খোদার কৃপায় মঙ্গলেই আছ। খুবই দুঃখের কথাটা জানাইতেছি আমার চাকরীটা নাই। কারখানার চারশত লোক বরখাস্ত কইরাছে। আমিও তাহার মধ্যে আছি। আগামী পরশ্ব তোমার ভাবীসাহেবারে লইয়া বাড়ী রওনা হইতেছি। তোমার বিবি ও মঙ্গল···

স্বপ্নোত্থিতের মত তিনটি মানুষ যাত্রীর ভিড় চীৎকারের মধ্যে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা বিরাট কালো জাল যেন নেমে এল চোখের উপর। কারখানার সেই ধোঁয়া উদ্গীরণকারী কালো চিমনিটা আর গঙ্গা কিনারের ঢালু জমিটা একাকার হয়ে একটা প্রচণ্ড শব্দে আর অভিনব দৃশ্যে মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। চাপা সমুদ্রের গর্জনের মত যাত্রীর চীৎকার আর সে শব্দে দিশেহারা নির্বাক নিস্পন্দ তিনটি মানুষ!

প্রত্যাবর্তন

সন্ধ্যার ঝোঁকে যখন গলিটা অন্ধকারে ভরে ওঠে, অস্থির হয়ে ওঠে শ্বাসরুদ্ধ ধোঁয়ায় এবং অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখা যায় গলির লোকগুলোকে তখন মনে হয় মানুষের জগত ছাড়া যেন কোন অন্ধকার গুহার অভ্যন্তর এটা। হাওয়া ঢোকে না এখানে বেরুবার পথ নেই বলে। সরকারি আলো নেই, কারণ সরকারী গলি নয় এটা। তাই মেথর খাটা বা ঝাড়ু দেওয়ার কথা এখানে অবান্তর। জলকলের কথা উপহাস মাত্র। মনে হয় আকাশ নেই গলিটার মাথায়।

এসময়ে বাসন্তী যখন তার কোমল বেড়া বিনুনিটিতে গিঁট দিয়ে ছোট ছোট হাতে উনুনে আগুন দেয়, তখন তার বাবা ঠাণ্ডারাম আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে রক্তচক্ষু আধবোজা করে এসে বসে উনুনের প্রায় কাছটিতে। তারপর একবার উনুনের ধোঁয়া ও বাসন্তীর মুখের দিকে দেখে চোঙ্গা মুখে দিয়ে কথা বলার মত মোটা গলায় বলে, লবাবের বেটির কোন রাজকাযটী হচ্ছিল এ্যাতখোন্, এঁ ? জানো না তোমার বাপ আসার সময় হল ?

রোজকার ব্যাপার, রোজকার কথা। বাসন্তী একটু সরে বসে যাতে ঘুষি লাথিটা এসে গায়ে না পড়ে। ঠাণ্ডারামের নেশাচ্ছন্ন মনে কারবাইড্ গ্যাসের মত উত্তাপ চড়তে থাকে। চা বিনা আফিমের ধোঁয়ানো নেশা আসে সাফ হয়ে।

বাসন্তীর অদূরেই তার পিঠের বোন হারাণী ঘুমিয়ে থাকে অন্ধকার কোণে, ওর সারা গায়ে গোবরের গন্ধ। পায়ে গোবর, গোবর তার হাতে শুকিয়ে থাকে। সারাদিন গোবর কুড়িয়ে আর চাপটি দিয়ে বসে থাকতে আর পারে না সে।

হারাণীর পিঠো পিঠি ভাই কেলো রোজ ঠিক এসময়টিতেই রকের ধারে রাস্তার পাশে কাঁচা নর্দমাটিতে বসে মলমূত্র ত্যাগ করতে এবং হাত মাথা নেড়ে গলার শির ফুলিয়ে দুলে দুলে শুরু করে গান।

ছকি, বাঁছি আল্ কি কালুল্ নাম জানে না···

তার এ গানকে যদি সানাইসুর মনে করা যায় তা'হলে ঠিক পোঁ'য়ের মত থেকে থেকে সাড়া দিয়ে ওঠে তার নিজের ভাই আটমাসের নোলা। সারাদিন ছেলেটা রকে হামা দিয়ে জলে কাদায় মাখামাখি করে বাসন্তীর কোল ধামসে একরকম থাকে। সন্ধ্যার ঝোঁকটাতেই শুরু করে কান্না।

ঠাণ্ডারামের জমাট নেশাটা ভেঙ্গে পড়তে চায় এ কান্নায় আর গানে। কেলোকে চেঁচিয়ে গান থামাতে বলে। কেলো শুনতে না পেলে সে প্রাণপণ চীৎকার করে ওঠে, ওরে শোরের বাচ্ছা, বাঁশী তোর বাপের নাম জানে। চুপ মার, নইলে তোর কেষ্টলীলা আমি ··

কেলো অন্ধকারে পিট পিট করে বাপকে দেখে কিন্তু গানটার আমেজ তার অবুঝ মনে এতই গভীর যে, গলা নামালেও গুন্‌গুনানি আর থামতে চায় না।

এরপরে আসে সুকি, অর্থাৎ সুকুমারী। ঠাণ্ডারামের পরিবার, লোকে বলে নবার মা। বড় ছেলের নাম তার নবা। সে আসে ফর্‌ফর্ করে, বসে ধপাস্ করে ঠাণ্ডারামের হাত খানেক দূরে। নোলাকে টেনে তুলে নেয় কোলের উপর। বুক থেকে কাপড়টা সরিয়ে স্তন গুঁজে দেয় তার মুখে। একবার দেখে নেয় উনুনে চায়ের জল চেপেছে কিনা তারপর ঠাণ্ডারামের দিকে খানিকক্ষণ কট্‌কট্ করে দেখে বাঁ হাতে মুখের থেকে পানের ছিবড়ের দলাটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বাইরে। আর একবার দেখে ঠাণ্ডারামের ঝিমুনি, তারপর নিজের মনেই কখনো ঠোঁট বাঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে নাক ফুলিয়ে হঠাৎ দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠে, অমন নেশার কপালে মারি ঝাড়ু।

ঠাণ্ডারাম হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে সটান হয়ে উঠে। তার তোবড়ানো মুখটা লম্বা হয়ে ওঠে এবং রক্তচক্ষু শিবনেত্র করে একবার সুকিকে দেখেই হেসে ওঠার

মত করে দাঁত বের করে ফেলে। চোখ কুঁচকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, এয়েছ ঠাকরুণ? বাঁচিয়েছ।

খ্যাঁকানোর চেয়ে এ তিক্ত খোঁচানি আরও অসহ্য। স্থকি রীতিমত গলা চড়িয়েই জবাব দেয়, আসব না তো নেশা করে পথে পথে ঘুরব? না, তোমার ভিটেয় এয়েছি?

—নাঃ, তোমার বাপের ভিটেয় এয়েছ। আরও তিক্ত আরও মোলায়েম করে বলে ঠাণ্ডারাম। তাতে স্থকি আরও চড়ে এবং ঠাণ্ডারাম নেশাখোর না লাথখোর সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলে, যার নিজের পেট চলে না, সে ওই থুথু খায় কি বলে? ভাগাড়ে মুখদে পড়ে থাক্‌গে না।

এইভাবে যখন হাওয়া গরম হতে থাকে, তখন আসে নবা। গায়ে ভরা ধূলো আর ঘাম, নাকের পাটা দুটো ফোলা, নিঃশ্বাস পড়ে ঘন ঘন। আসে যেন পথের ধারে এটা একটা চা-খানা। গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে থাকা জামাটা খুলতে খুলতে বলে, লাও জলদি চা লাও।

গলার স্বরটা তার ছেঁড়া, সরু ও ঝাঁজালো। চেহারাটা প্রায় ঠাণ্ডারামের ইয়ারের মত হয়ে উঠেছে।

সে এসে ঢুকতে না ঢুকতেই হাজির হয় তার পিঠের ভাইটা কেষ্ট। ঠাণ্ডারাম বলে, ম্যানেজার সায়েব। একটা ফুল প্যাণ্ট তার পরনে, জামাটা বেশ খানিকটা পরিষ্কার এবং সেটা গুঁজে দিয়েছে প্যাণ্টের মধ্যে। পায়ে ক্যাম্বিসের তলিমারা জুতো। মাথার টেরিটি সুস্পষ্ট ও আঁচড়ানো। ফিটফাট কেষ্ট সকলের থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব রক্ষা করে ফুঁ দিয়ে হাত দিয়ে ঝেড়ে ঘুমন্ত হারাণীর কাছে আল্‌গোছে বসে। বাসন্তী সবাইকে চা দেয়। সবাই যখন চা পান আরম্ভ করে তখন হঠাৎ মনে হয়, সকলেই পরম তৃপ্ত। হ্যাঁ তৃপ্ত বটে, কিন্তু এর মাঝে আছে এক দারুণ রুদ্ধ গুম্‌সানি। লম্ফর শিখটাও এসময়ে স্থির হয়ে থাকে। এরা সকলেই রোজ কামানোর লোক। ঠাণ্ডারাম একটা সেলুনে কাজ করে, ওটা তার জাত ব্যবসা। স্থকুমারী করে ঠিকা ঝি'য়ের কাজ। নবা রিক্‌সা চালায়, কেষ্ট

হাফ্‌-বেকার। কখনো কাজ পায়, কখনো বসে থাকে। রিক্‌সা চালাতে সে নারাজ।

চা খেতে খেতেই সুকি আরম্ভ করে, নেশার মৌতাত তো জমাচ্ছো, পয়সা বের কর পিণ্ডি গেলার!

ঠাণ্ডারাম যেন শুনতেই পায়নি এভাবে সে মহা আরামে চায়ে চুমুক দিতে থাকে।

নবা কেষ্টও চায়ের গেলাসে তাড়াতাড়ি চুমুক দেয়।

সুকি তাদের দিকেও তাকিয়ে বলে, চা তো গিলছিস্ সব, পয়সা দে ঘরের।

কে কার কথা শোনে।

ঠাণ্ডারাম বলে ওঠে, তুই কে পয়সা নেয়ার। অ্যাঁ! আমি থাকতে তুই কে? দে, তোর পয়সা দে দিকিনি।

সুকি অমনি জ্বলে ওঠে তুবড়ির মত, ওরে আমার লাট্‌রে, ওকে নেশা করতে আমি পয়সা দেব। দেব, ঝাড়ু দেব।

নেশাই জমুক আর দেহে বলই বাড়ুক, যাই হোক, এবার ঠাণ্ডারাম রুদ্রমুর্তিতে হেঁকে ওঠে, চো—প, চোপরাও শালী। তোর বাপের পয়সায় নেশা করি রে? দাও পয়সা, দে লবা, তোর পয়সা দে।

নবা বলে ওঠে, লবারটা বড় মিষ্টি, না? আগে তোমারটা দেও, কেষ্টা দিক্ আগে।'

কেষ্ট একবার জ্বলন্ত চোখে নবাকে দেখে বলে, আজ কিছু কামাইনি।

ঝেঁজে ওঠে নবা, কামাস্‌নি তো খাস্ কেন? বাণচোৎ মেয়েমানুষের বাড়ী যাস্ রোজ রাতে।

তোর পয়সায় খাই না খাই। বেশি বলবি তো—

নবা তেড়ে আসে, মারবি, মার্‌না দেখি।

সুকি মারামারির তোয়াক্কা করে না কিন্তু পয়সা হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে আগেই দুজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বলে, লাথ্‌খোরেরা যেখানে খুসী ম'রগে যা, আগে পয়সা দে।

ঠাণ্ডারামও গর্জ্জন করে উঠে আসে, হ্যাঁ, পয়সা দাও আগে।

নবা এক ধাক্কায় ঠাণ্ডারামকে দেয়ালের গায়ে সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ হিন্দিতেই বাপ্‌কে বলে ওঠে, চোপ শালা, বাবাগিরি ফলানে আয়া?

তারপরেই হঠাৎ তাদের চারজনের মধ্যে একটা দারুণ ধ্বস্তাধ্বস্তি পেটাপিটি শুরু হয়ে যায়। কে কার লক্ষ্যস্থল বোঝবার যো থাকে না। কিল চড় লাথি ঘুষি আর মাঝে মাঝে সুকি বলে ওঠে, জগা নাপ্‌তের বেটি হই তো—

ঠাণ্ডারামেরও গলা শোনা যায়, বাপের ব্যাটা হই তো—

বলতে বলতে তাড়াতাড়ি মার বাঁচিয়ে জলভরা ঘটিটা উবু করে উনুনে ঢেলে দেয়। ভোঁ-স করে উনুনটা যায় নিভে। তার ফলে মারামারিটা আরও জমে।

নবা বলতে থাকে, খুন করেঙ্গা আজ···

কেষ্ট যুগপৎ জামা প্যান্ট ও টেরি আগলাতে আগলাতে এবং সামনের আটার হাঁড়িটা লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে, আর ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যেই বলতে থাকে শালাদের উপোস না রাখলে টিট্‌ হবে না।—

এ দৃশ্য খানিকক্ষণ দেখতে দেখতে বাসন্তীরও চোখ মুখ জ্বলে ওঠে এবং হঠাৎ যে কোন একজনের উপর পড়ে আঁচড়ে খামচে দিতে থাকে।

ঘুমন্ত হারাণী আচমকা ককিয়ে ঘুম ভেঙ্গে ডুকরে চীৎকার করে উঠেই যাকে সামনে পায়, তার কোমরে পায়ে কামড়ে ধরে।

কেলো সুযোগ বুঝে গলা ছেড়ে গান ধরে,

ছকি, আমি যখন বছে থাকি গুলুজনের মাঝে
নাম ধলিয়ে বাজায় বাঁছি···

আর একটা ছোট লাঠি দিয়ে রকের ধারে পিপের টিনের বেড়াটা পিটতে থাকে, ঝম্ ঝম্ ঝম্···

আটমাসের নোলা সারাদিন পরে মায়ের স্তন পেয়ে আবার হারিয়ে তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দেয়। লম্ফর লাল্‌চে আলোয় ছায়াগুলো আরও কিম্ভূতকিমাকার হয়ে ওঠে। মানুষ নয়, মানুষের একটা দলা যেন ছটফট করে। আগুনে জল

পড়ে ধোঁয়া উঠতে থাকে উনুনের। কলসিটা থেকে জল গড়িয়ে কাদা হয়ে যায়।

মনে হয়, এরা মা নয়, বাপ নয়, ছেলেমেয়ে নয়, ভাই বোন নয়। একদল ক্ষিপ্ত জানোয়ার পরস্পরকে আক্রমণ করে গিলে খেতে চাইছে।

অন্ধ সুড়ঙ্গের মত গলিটার খুপ্‌রি ঘরগুলোতে এদের মরণ কামনা করতে থাকে কটুক্তি আর শাপমন্যিতে, কেউ হাসিতামাসা করে খিস্তি খেউড়ের ঢেউ তুলে।

এই হয় রোজ। যেন এটা ওদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

তারপর ওরা নিজেরাই একসময় থামে, থেমে বসে হাঁপাতে থাকে। ঠাণ্ডারাম মোটা গলায় কাঁদে বোধ হয় নেশা ছুটে যাওয়ার জন্য, সুকি ভূতে পাওয়ার মত কাঁপানো সরু গলায় বিড়বিড় করে, নবা খিস্তি করতে থাকে. কেষ্ট থাকে চিরুনি দিয়ে টেরি বাগাতে, বাসন্তী, হারাণী আর কেলো কোথায় লুকিয়ে পড়ে অন্ধকারে কিছুক্ষণের জন্য। এমনি হয় রোজ।

কিন্তু তাদের জীবনের রোজকার এই বাঁধাধরা গতি একদিন হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে আচম্‌কা একটা মস্ত ফাটল ধরে যেন এক বিচিত্র প্রাণের ধাক্কায় ও টানে চিড় খেয়ে গেল।

সেদিনও যখন এমনিভাবে আস্তে আস্তে ফুঁয়ে ফাঁয়ে চাপা আগুন ধ্বক্‌ করে জ্বলে উঠতে যাবে ঠিক সেই সময় বাসন্তী তার মায়ের হাত দুটো ধরে কান্নাভরা গলায় বলে উঠল, মা থাম্‌, দাদা থাম্‌ তোরা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা, থাম!...

তারা এমন কথা আর কোনদিন শোনেনি, সবাই হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে অবাক্‌ হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সবাই ভেবেছিল রোজকার মত আজ হয় তো সে কাউকে কামড়ে খামচে দিতে আসছে কিন্তু আজ সবাই তাজ্জব হয়ে দেখল বাসন্তীর মুখটা কান্নার বেদনা ও যন্ত্রণায় অপূর্ব হয়ে উঠেছে। কেন?

অবশ্য কিছুদিন থেকে সে এমনিতেই সরে সরে থাকত। কিন্তু আজ...

—থাম্‌ তোরা থাম্‌ পায়ে পড়ি। বলতে বলতে সে ফুঁপিয়ে উঠল।

ঠাণ্ডারাম বাসন্তীকেই একটা ঘুষি তুলেও হঠাৎ থেমে গেল। কী করুণ আর মিনতি ভরা মুখ হয়েছে মেয়েটার! তবু খানিক ভয় ভয় ভাব।

নবার সটান লাথিটা থেমে গিয়ে পা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বোন বাসি'র ভাসা ভাসা চোখ দুটোতে জল দেখে প্রাণটা তার চমকে উঠল।

কেষ্ট জামা আর টেরি বাগাবে কি, সে খালি তাকাতে লাগল, বাসিটা এত সুন্দর!…

সবাই অবাক্। এমন কি কেলো পর্য্যন্ত গান ভুলে দিদির অমন মুখখানি হাঁ করে দেখতে লাগল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে চম্‌কে উঠল সুকি। দেখল, বাসন্তীর সারা শরীর যেন কি জাদুতে উজ্‌লে উঠেছে, ছেঁড়াখোড়া ময়লা ফ্রকটা ফেটে যেন উছ্‌লে উঠতে চাইছে শরীরের প্রতিটি রেখা। বেড়া বিনুনি নেই, নিজের হাতে বাঁধা তার বাঁকা খোঁপা, হাতে পায়ের গোছ হয়ে উঠেছে ভারী শক্ত আর সুন্দর। হায় পোড়াকপাল, ছুড়ি যে কবে ধুমসী মাগী হয়ে গেছে।

খপাৎ করে মেয়ের হাত ধরে ঘরের ভিতরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল সুকি। বিড়বিড় করতে লাগল, আ সব্বোনাশ, ছুঁড়ির জল নেগেছে কবে গো, বাড় নেগেছে ক'বে?…

বলে তাড়াতাড়ি নিজেরই একটা ছেঁড়া ময়লা শাড়ী জড়িয়ে দিল বাসন্তীর গায়ে আর মনে মনে বলতে লাগল, তাই! ছুঁড়ির শরীরে রং নেগেছে, মনে রং নেগেছে, সাত পাঁচ ওর ভাল লাগে না, ওর ভাল লাগে না এত ঝম্ ঝামেলা তাই…তাই।

আর জীবনে বুঝি এই প্রথম বাসন্তী মায়ের রুক্ষ বুকটাতে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, তোরা এমন করিস্‌নে মা, আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে।

বাইরের ক্ষিপ্ত মানুষগুলো এই ফোঁপানি শুনতে শুনতে পরস্পরের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে যে যার জায়গায় বসে পড়ল। তাদের কানের মধ্যে বারবার সেই একই সুর বাজতে লাগল, তোরা থাম্…থাম্। এবং এক বিচিত্র

বেদনা বোধে সকলেরই মনটা যেন কিসের আঘাতে টন্‌টন্‌ করতে লাগল। কে জানত তাদের লাথ্‌ঘুষিখেগো বাসি আবার অমন কথা বলতে পারে আর ঘরের এসব কাণ্ড দেখে গলায় দড়ি দিতে মন চায়।

ঠাণ্ডারাম গম্ভীরগলায় বলে উঠল, হুঁ, ছুঁড়ি ডেসেছে। খো-উব হুসিয়ার, হাঁ বলে দিলুম।

বলতে বলতে একটা দীর্ঘনিশ্বাসে তার গলার স্বর হারিয়ে গেল। তার প্রথম জীবনের ছবিটা ভেসে ভেসে উঠতে লাগল চোখের সামনে।

নবা আর কেষ্টর মনটা হঠাৎ কেমন বাউল বিবাগী হয়ে উঠল।

নবা বলল, না, কিছু ভাল্‌ লাগে না আর শালা।

কেষ্ট বলল, চলে যাব মাইরী কোথাও।

হঠাৎ আজকে তাদের সকলের কাছে চল্‌তি জীবনটা বড় অসহ্য ক্লেদাক্ত আর ভারী হয়ে উঠল। এ ঘরের বাসিন্দাদের মৃত্যু কামীরা ভাবল বুঝি আজ সন্ধ্যা নামেনি গলিটাতে। কে জানে গলিটার মাথায় আজ আকাশ দেখা দিয়েছে কিনা।

অম্বুবাচির রজস্বলা গঙ্গার অথৈ লাল জলে আচমকা চোরা বাণ এসে তার শক্ত শুকনো পাড়কে ভিজিয়ে নরম করে দেওয়ার মত ঠাণ্ডারামের পরিবারটা যেন খানিকটা প্রাণের রসে ভিজে উঠল। তাদের সে প্রাণগঙ্গা হল বাসন্তী, তাদের বাসি।

মানুষ তার মনের হদিস কতটুকুন পায়। নবা সেদিন যে মন নিয়ে বলেছিল, কিছু ভাল লাগে না, সে মনই আবার তার মনে মনে গাইল, জগতের সবাই আর কিছু খারাপ নয়। কেষ্টর যে বিবাগী প্রাণটা মাইরী দিব্যি কেটে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল, তার মনে হল যেন মায়া পড়ে গেছে হা-ভাতে ঘরটার উপর। মেয়ের বয়সের ভারে যে সুকির বুকে পোড়ানি লেগেছিল, সে সব

পোড়ানি কাটিয়ে খানিক কন্যে-সোহাগী মা হয়ে উঠল আর ডাসা মেয়ের হুসিয়ারি করতে গিয়ে ঠাণ্ডারাম নিজের মনটাকেই দিতে লাগিল হুসিয়ার করে।

হারাণী আর কেলো জ'ন্মে অবধি যাকে দিদি বলেনি, তাকেই তারা দিদি বলে আদর কাড়ানো শুরু করল।

আর বাসি···হাসিতে গাম্ভীর্য্যে পরিশ্রমে নবরসে এক নতুন কিশোরী সকলের মন কেড়ে এ ঘরের উনুন আস্তাকুড় থেকে মানুষগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। যেন সকলের আপদ বালাই বিষজ্বালা নিয়ে থুয়ে মনে আর শরীরে আলো নিয়ে ভাঙ্গা অন্ধ ঘরটায় মশালের মত জ্বলছে।

তা বলে কি এ ঘরের বিবাদ বিসম্বাদ, পয়সা নিয়ে কাড়াকাড়ি গালাগালি খেয়োখেয়ি একেবারেই শেষ হয়ে গিয়েছে। না, তা যায়নি।

তারা এখনো পরস্পরকে আক্রমণ করে বসে, হঠাৎ শুরু হয়ে যায় লাথি ঘুষির ঝড়, ছোটে গালাগালির তোড়। কিন্তু বাসি প্রতিমুহূর্তে তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

ঠাণ্ডারাম তেমনি আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে এসে উনুনের ধারে বসে, সুকি তেমনি গালাগাল দেয়···ঠাণ্ডারাম মারবার উদ্যোগ করলেই বাসি গিয়ে মাঝখানে পড়ে; তখন ঠাণ্ডারাম বাসিকেই বলে, ছাখ্ দিনি হারামজাদীর কাণ্ড, সরিয়ে নে যা ওকে, নইলে মারব মুখে—

সুকিও তড়পে ওঠে, মার্ দিকি মিন্‌সে, দেখি—

বাসি মায়ের হাত চেপে ধরে, মা থাম্।

বাপের পায়ে হাত রেখে বলে, তা বাবা তুমি সব পয়সায় নেশা করলে সম্‌সার চলবে কেন?

ঠাণ্ডারাম অমনি ধম্‌কে ওঠে, এ্যাই চোপ্। ডেপোমি করবি তো মারব এক থাব্‌ড়া।'···তারপর হঠাৎ যেন একেবারে ঝিমিয়ে পড়ে জোর করে নেশাচ্ছন্ন চোখের পাতা একটু খুলে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে, কোথা ছিলি অ্যা? সেদিনে ছিলি কোথা, যেদিন পয়লা নেশায় হাতেখড়ি হল? আজ যখন মরতে বসেছি···

হঠাৎ চুপ করে গিয়ে আবার তার গলায় যেন গোঙ্গানি ওঠে, ওই তোর মা, মাগী বিয়োতে লাগল কাঁড়ি কাঁড়ি, এ ঘরের পেট হল অভর, শালা খালি দে দে খাই খাই···। তো নেশা করব না তো কি করব? কি করব? খুন করব না ডাকাতি করব?...আর গাইরী বলছি, লোকের মাথার শালা চুল গজানোই কমে গেল না কি নাপ্তের বংশই বেড়ে গেল, দুটো খদ্দের পাওয়া যায় না সারাদিনে!···

তারপর হাত ঝটকা দিয়ে বলে, এ শালার দুনিয়া বিগড়ে গেছে, নইলে বামুনের ছেলে সেলুন ঘর খুলে বসে?

সুকির প্রাণে খোঁচা লেগেছে। তাই সেও সুর করে বাসিকে মধ্যস্থ করে, তা বল্ তুই বাসি, আমি বিয়োলুম কাড়ি কাড়ি, সে কি আমার দোষ? বলি জগা নাপ্তের বেটি কবে ভেবেছিল লোকের দোরে দোরে ঘুরে ঝি খেটে মরবে, মিন্সের ঝাঁটা নাথি খাবে।···তো বলি, কি না ছেলে আমার? কিন্তুন্···এ সম্সারের ঝকমারি কলের ঠাওর পাইনে আমি।···

থাক্ থাক্···বলতে বলতে ঠাণ্ডারাম হয়তো কখনো হঠাৎ কিছু পয়সা বাসির কাছে বাড়িয়ে দেয়। নে যা ছেল নিয়ে নে। কাল যদি কামাই হয় তো মরব নেশা বিনে দেখিস্। বলে তোবড়ানো মুখটায় বিচিত্র হেসে বলে বাসিকে, তখন কিন্তু কিছু দিস্ অ্যাঁ? লইলে তোর বাপ্···বলতে বলতে আবার হঠাৎ বিকৃত মুখে বলে, হু, খুব ডেঁপো হয়ে গেছিস্। খোউব হুসিয়ার!···

সুকিও তার রোজ কামানোর প্রাণধরা পয়সা একটি একটি করে টিপে টিপে দেয় বাসিকে দু'চোখ ভরা সংশয় নিয়ে। অর্থাৎ সাবধান, একটি পয়সা যেন এদিক ওদিক না হয়। তারপর নিজেই আবার বলে, শোন্পাপড়ি না কি খেতে চেয়েছিলি? খাস্, খাস্ কালকে দু'পয়সার।··

নবা এসে রোজই সেই এক কথা বলে, মাত্তর পাঁচসিকে পেয়েছি। অর্থাৎ রিক্সার মালিককে ভাড়া বাবদ রোজ পাঁচসিকে দিতে হয়। অতএব···কেষ্টকে দেখিয়ে বলে, ও দিক না।

বলতে না বলতেই তাদের পরস্পরের মধ্যে লেগে যায়। সুকি ঠাণ্ডারামও

বাদ যায় না। তারাও হামলে পড়ে এবং ছেলের পয়সায় মায়ের হক্ বেশী না বাপের হক্ বেশী সমস্যায় হঠাৎ এক হুড়োহুড়ি আরম্ভ হয় হয় প্রায়।

বাসি অমনি সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ঠাণ্ডা করে সবাইকে। নবাকে বলে, থাক্ দাদা, না থাকলে কোত্থেকে দিবি ?

নবা সরু গলায় হিহি করে হেসে ওঠে, পরমুহূর্তেই বুক ঠুকে বলে, নবা রিক্সাওয়ালার প'সা নেই মানে ? হে: বলে শালা ঘেয়ো কুকুর সোয়ারি হলেও ছাড়িনে জানিস্ ? এই মোটর বাস চালু হয়েই যতো সর্ব্বোনাশ করেছে নইলে···

বলে পয়সা বাড়িয়ে দেয় বাসির হাতে। চেয়েও দেখে না কেষ্ট পয়সা দিল কিনা কিংবা রইল কি না নিজের খরচের পয়সাটা।

কেষ্টও লুকোয় না। হয়তো তার একটা সৌখিন রুমাল কিম্বা একটা চিরুনি কেনার সাধ ছিল। কিন্তু বাসীর কাছে মিছে বলতে কেমন খচ্ খচ করে। যা থাকে সব দিয়ে বলে, নে, কানু মুদীর দরজার পাল্লাটা সারিয়ে দিয়েছিলাম, কিছু পেয়ে গেছি।

তারপর দারুন দুঃখে ও রাগে ফোঁস্ করে ওঠে, শালা দিনকালও তেমনি হয়েছে, একটা কাজ তো দূরের কথা, চটকল গুলোতে রোজ দুটো চারটে মিস্তিরি তাড়াচ্ছে।

সারাদিন খাটুনির পর সব ঝাড়ঝামেলা কাটিয়ে সবাই উনুনের কাছে বাসিকে ঘিরে বসে। বাসি রুটি বেলে বেলে সেঁকে সবার পাতে পাতে দিতে থাকে।

সবাই খেতে থাকে আর তাদের প্রাণের যত কথা সব পেড়ে বসে বাসির কাছে।

ঠাণ্ডারাম তো বলবার ফাঁক না পেয়ে চেঁচিয়েই ওঠে, থাম্‌বি তোরা, আমাকে একটু বলতে দিবি নাকি যত কেরামতি তোদেরই।

প্রাণটা ভরে ওঠে বাসির। প্রাণের খুসীর গমকে মুখে তার হাসিতে সোহাগে অপূর্ব্ব হয়ে ওঠে। সে হাসির ঢেউই যেন তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে পরম গাম্ভীর্যে ও জৌলুসে।

এসময়ে এদের দেখলে মনে হয়, কোনদিন এরা বিবাদ করেনি, মারামারি করেনি, খেয়োখেয়ি কামড়াকামড়ি করেনি পয়সার জন্য। সুখে দুঃখে ওরা পরস্পরের গায়ে গা দিয়ে বেঁচে আছে।

শুধু এই নয়, আর কিছু ছিল। সে হল বাসির ঢল নামা যৌবন ও নীলাকাশের মত মস্ত প্রাণটাতে আর একজনের আনাগোনা। সে যেন এক পক্ষীরাজের পিঠে চাপা রাজপুত্তুর, বাসিকে নিয়ে উড়ান দিয়ে নিয়ে চলে যেতে চায়।

বাসি যখন ঘরের মানুষগুলোর প্রাণ ঠাণ্ডা করে, প্রাণতোষ করে বসিয়ে খাওয়ায়, তখন সে এসে রোজ দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে কিম্বা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে আসে।···শক্ত কালো জোয়ান ছোকরা, নাম পবন। এ বস্তিরই উল্টোদিকে একটা ঘরে থাকে, কাজ করে ফিটার মিস্তিরির, রোজগার নেহাৎ মন্দ নয়। খায় প'রে একলা, মা ছিল, মরে গেছে। তারপর কিছুদিন পবন এ ঘাটে সে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছে বাউণ্ডেলের মত। কিন্তু সে ভারী ওস্তাদ কারিগর, লোহা আর মেশিনের সঙ্গে তার মিতালী গভীর। আবার কাজ ধরল। কিন্তু কেমন যেন নিজের মনপ্রাণের হদিস হারিয়ে ঝিমিয়ে প'ড়ল সে। অবশেষে ঘরের কানাচে যেদিন বাসিকে আবিষ্কার করল, সেদিন থেকে তার প্রাণের পালে হাওয়া লেগে গেল।

কেমন করে জানিনা, বাসি যেন আষ্টে পৃষ্টে ধরা পড়ে গেল পবনের কাছে। তাতে তার কিশোরী মনটা যেন ভরা গঙ্গার মত তীব্র স্রোতবাহী অথচ গম্ভীর মৌনতায় ভরে উঠল। রহস্যময়ী হয়ে উঠল তার ঠোঁটের রেখাটি, বিচিত্র ভাব ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠতে লাগল তার ভাসা চোখ দুটোতে।

আবার এ রূপের মহিমায় ঘরের মানুষগুলোও কেমন যেন অবাক্ মানে অথচ এক অপূর্ব্ব আনন্দে তাদের ক্ষতবিক্ষত বুকগুলো ভরে উঠে। যেন যৌবন এসেছে এই অন্ধবদ্ধ সারা ঘরটাতে।

প্রাণ-খানিক খুলে গেছে কেলোরও। দুপুর বেলা দিদির কাছে তার কেষ্টলীলা গাওয়ার ভয় নেই। সে থেকে থেকে গান ধরে।

ছকি, কেন কুঞ্জেল ধালে দাঁলিয়ে কালা,

ফিলে যেতে বল্।

সে গানে হঠাৎ বাসিরও মনটা নেচে ওঠে। মনে হয়, যেন রাধিকার মত মিলনের ছল্ খুঁজে সে-ই পবনকে অভিমান করে ফিরিয়ে দিচ্ছে। সে চোখ ঘুরিয়ে কপট বেদনার ভাব করে বলে, কেন বলব ফিরে যেতে?

কেলো কেষ্টযাত্রার রাধার ঢংএ গেয়ে ওঠে।

আমি না বুঝে ছুঝে লাখালের ছঙ্গে মজে,

ছকি তাল পেলেম পিতিফল।

তাই কি? হাসতে গিয়ে থম্‌কে যায় বাসি।…তার কানে বাজে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পবনের প্রাণের ডাক; বাসি চল চলে যাই, ঘর করিগে দুজনে বেশ সোন্দর, তুই আর আমি।…বাপ ভাই কি কারুর নেই না চেরকাল থাকে? আমি ভ্যান্‌তাড়া করে ঘুরি, পয়সা কিছু জমিয়েছি, সব লষ্ট হয়ে যাবে, চল চলে যাই, হ্যাঁ।…

সঙ্গে সঙ্গে বাসির চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঘরের মানুষগুলোর শুকনো পোড়া মুখগুলো, তাদের সেই মারামারি গালাগালি কাড়াকাড়ি, তাদের হাসি কান্না সোহাগ।…সে বলে, যাব যাব, কিন্তু যেতে পারে না।

কোলের ভাই নোলাটাও অদ্ভূত হয়ে উঠেছে। বাসিকে শাড়ী পরা দেখে বোধ করি মা ভেবেই তার অশক্ত নড়বড়ে ঘাড়টা মাটী থেকে তুলে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আঁউ আঁউ করে কেঁদে ওঠে। কোলে উঠেই নোলা আজকাল বাসির বুকে মুখ ঘষে কাঁদে।

বাসি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বলে, এই সেরেছে, আমি কি মা নাকি রে?

নোলা সে সব বোঝে না, কেবলি হাঁই হাঁই করে আর মুখ ঘষে।

শেষটায় বাসি ঘরের অন্ধকার কোন্‌টায় গিয়ে সত্যি সত্যি ভাইয়ের মুখের কাছে তার শক্ত পুষ্ট বুক খুলে দেয়। কিছুই হয় তো নোলা পায় না। তবু

অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে পরম শান্তিতে। কেবল কাঁটা দিয়ে ওঠে বাসির সারা শরীরে, মাথাটার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে। তার পরে অবাক হয়ে দেখে বিন্দু বিন্দু ঘামের মত সাদাটে গাঢ় রস ফুটে বেরুচ্ছে তার স্তনের বোঁটায়। মুহূর্তে তার সারা শরীরটা দুলে উঠে, হাসি কান্নার বেদনায় ভরে ওঠে বুকটা! উদাস হয়ে যায় মনটা। তাড়াতাড়ি নোলাকে শুইয়ে দিয়ে ঘরের ফোঁকড় দিয়ে এক চিমটি আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে, চলে যাব চলে যাব।

কিন্তু তার পরেই আসে সন্ধ্যা। রাজ্যের বোঝা ঠেলে মানুষগুলো ফিরে আসে তিক্ত উত্তপ্ত মনে। রুক্ষ শুক্‌নো ধূলোকালিভরা চেহারা নিয়ে, নিয়ে চড়া ভরা মেজাজ।

তবু আজকাল তাদের কাড়াকাড়ি খেয়োখেয়ি অনেকটা কমে শান্ত নরম হয়ে এসেছে মনটা।

বরং ঠাণ্ডারাম হয় তো কারচুপে দু'পয়সার ঘুগ্‌নিদানা বা একটুকরো বোম্বাই আমসত্ব বাসির হাতে তুলে দেয়, নবা হয় তো নিয়ে আসে বাসির বড় সাধের সর-পুটি, কেষ্টর হাতে ঝল্‌কে ওঠে সরস ব্লাউজের ছিটের একটা ফালি কিম্বা একরাশ কাচের চুড়ি। আর কি হুপে, কি প্রাণপণে যে কেষ্টা দাল্‌দা ঘিয়ের কারখানায় প্যাকিং বাক্‌স বানাবার কাজটা পেয়েছে, তা বাসি ছাড়া বুঝি কেউ জানে না।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। সুকির চেয়েও যে হারানীর পয়সা হল প্রাণ, সেও তার ঘুটে বিক্রীর পয়সা বাসির হাতে তুলে দেয়।

মাঝে মাঝে তাদের মন কষাকষি বিবাদে হঠাৎ তারা, তাদের মেয়ে ও বোন বাসির কাছে বিচার দাবী করে বসে!

বাপ মা ভাই বোন মিলে এক ভরা সংসার তাদের।

পবনের ব্যাপারটাও সকলেই আচ করে নিয়েছে এবং সকলেই তারা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয় পবনকে।

নবা বলে, শালার চোখ গেলে দেব এদিকে তাকালে।

কেষ্টার রাগটাই বোধ হয় বেশী কেন না সেও মেশিনের কাজকর্ম জানে কিছু

আর জামা কাপড়েও পবন ভারী ত্বরন্ত। বলে, শালা ভারী মিস্তিরি। লোহা কাটতে পারলেই হল। ঝাড়ব একদিন রদ্দা, বাপের নাম নে ঝরে পড়বে।

স্থকিও চোখ পাকায়। ঠাণ্ডারাম বলে, লে আয় ব্যাটাকে, আপিম গুলে খাইয়ে ফেলে দিয়ে আসি গঙ্গায়। নেশাও হবে, মজাও বুঝবে।

তারপর তারা বাসিকেও বলে দেয়, খুব হুসিয়ার। ওই মুদ্দোটাকে একদম ঘেসতে দিস্‌নি।

কোন কোন দিন হঠাৎ তারা সবাই তাদের তিক্ত সংশয়ে ফেটে পড়ে ; হিসেব চেয়ে বসে বাসির কাছে ; দে, হিসেব দে, কালকের প'সার। কি করছিস্ কারচুপে কে জানে।

বলে তারা ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মত ঝাঁপিয়ে পড়বার উদ্যোগ করে।

বাসি দাঁতে দাঁত চেপে কান্না রোধ ক'রে তাদের পাইপয়সাটির হিসাব দিয়ে দেয়, বরং তার বুদ্ধির দৌড়ে এদের হিসেবের কড়ি বাড়তিও থেকে যায়।

মুহূর্তে সব মানুষগুলো ধিক্কারে লজ্জায় একেবারে স্তব্ধ হয়ে মাথা নীচু করে নেয়, মুখ লুকোয়, মুখ ফুটে ক্ষমা চাইতে পারে না। তোবামোদের হাসি হাসতে গিয়ে হঠাৎ বিষন্ন হয়ে এক বোবা বেদনায় ও গভীর সংশয়ে ড্যাবা ড্যাবা চোখে নতমুখী বাসির দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাসি মনে করে, তবু তো এইটুকুন, কুরুক্ষেত্তর তো করেনি।

আর ওরা পরস্পর হঠাৎ 'কে আগে হিসেব চেয়েছে' তাই নিয়ে বিবাদ স্থরু করে দেয়। বাসি আবার মাঝে এসে দাঁড়ায়।

পবনের প্রাণের দামামা আরও উদ্দাম হয়ে ওঠে, প্রাণটা ছটফট করে শক্ত শরীরের পিঞ্জরে। সে কারখানা পালিয়ে দিনের নিভৃতে আসে মাঝে মাঝে।

অনুরাগে, আবেগে অস্থির হয়ে সে বাসির হাত দুটো ধরে বলে, চল্ বাসি চল্। মাইরী তোর এ থম্‌কানি আর সয় না। বাপ ভাই কি আর কারুর থাকে না?

বাসি তবু থম্‌কে থাকে। কি বলবে, ভেবে পায় না।

পবন হঠাৎ রেগে মাটীতে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে বলে, আমি মরে গেলে যাবি? ধ্যাত্ শালা, আর যদি আসি তো—

একটু গিয়েই আবার সে ফিরে এসে বাসির সামনে দাঁড়ায়।—

অসহায় চোখে, বেদনায় বঙ্কিম ঠোঁটে, আড়ষ্ট মনে অবহেলায় ঝোঁকা শরীরে এক বিচিত্র বেদনায় অথচ কি অপূর্ব্ব রূপ যে ফুটে ওঠে বাসির সারা শরীরে! প্রাণ ও মনের জোয়ারের কুলুকুলু ধ্বনি যেন শোনা যায় তার শক্ত বলিষ্ঠ শরীরটার রেখায় রেখায়।

পবন হাটু গেড়ে বসে পড়ে হাত বাড়িয়ে দেয় পায়ের কাছে, আমি পারব না বাসি, তোকে ছাড়তে পারব না। চল্ চল······

বাসিও পারে না, ভেঙ্গে পড়ে। পবন যে তার ভালবাসার মানুষ। শক্ত জোয়ান ফিটফাট ওস্তাদ কারিগর পবন!

পবনের পায়ে ধরা হাত দুটো বুকে তুলে বলে, যাব, ঠিক যাব।

পবনের গলা কেঁপে ওঠে, কবে?

যবে বলবে।

আজকেই?

বেশ।

হাসতে গিয়ে আটকে গেল পবনের বুকে। দিশেহারা হয়ে সে হঠাৎ একলাফে কারখানার দিকে ছুটল। বাসি ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে হাসল, কতরকম তার ভাব। ফিস্ ফিস্ করে উঠল, আমার ঘর, সম্‌সার, ছেলে, পবন।—

সন্ধ্যার ঝোঁকে অন্ধ সুড়ং গলিটার মধ্যে সুকিদের রকটা অন্ধকারে ঘাপটি

মেরে বসেছিল এবং সবাই ফিরে এসে অবাক বিস্ময়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর লম্ফটা জ্বালতেই খালি উনুনটা, চায়ের জলের হাঁড়িটা হাহাকার করে উঠল।···এক কোণে হারাণী বসে আছে নোলাকে নিয়ে। কেলো বসে আছে এক কোণে একটা কুকুর বাচ্চার মত। হাতা খুন্তি কড়াগুলো যেন ঠুঁটো জগন্নাথের মত পড়ে আছে, উনুনের ধারে পিঁড়েটা পাতা, কিন্তু যেন কতদিন ধরে।

সুকি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, বাসি কোথা?

হারাণী বলে, চলে গেছে?

চলে গেছে? কোথা?

পবন মিস্তিরির সঙ্গে।

পবনের সঙ্গে? হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সুকি হারাণীকেই দড়াম করে কষাল এক লাথি।

সে হাউমাউ করে নোলাকে ফেলে দিল ছুট্।

তারপর তারা সকলেই হাঁক ডাক চীৎকার সুরু করে দিল, লে আও শালাকে, মেরে ফেলব ওদের, ছুটোকেই আজ খুন করব।··· ··

কিন্তু কোথায় তারা। চীৎকারটা তাদের নিজেদের কানেই অসাড় ঠেকতে তারা থেমে গেল।

ঠাণ্ডারাম তার নেশাজড়ানো গলায় বলে উঠল সুকিকে, বলেছিলুম কিনা, ছুড়ি খোউব ডেঁপো হয়েছে, পেকেছে আর অমনি টুপ্ করে খসেছে। এ্যাই তোর—মাগী সব তোর দোষ।

সুকিও অকারণ দায়দোষে রুখে উঠল, ছ্যাচড়া মিন্‌ষে, আমার দোষ হল? সোহাগ করে আমি লুক্কে লুক্কে ঘুগ্‌নি খাওয়াতুম?

চো-প্।

তুই চোপ্। সুকিও বলে।

নবাও বলে উঠল, সব তোদের দোষ। কেষ্টকে বলল, যা না, খুব চুড়ি এনে দে, জামা এনে দে...

তুই-ই তো মাছ এনে খাওয়াতিস, আবার আমাকে বল্‌ছিস্?

পরস্পরের এমনি ঝগড়ায় ঝগড়ায় তারা পরস্পরের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েও হঠাৎ থেমে গেল। আচমকাই তাদের নজরটা গিয়ে পড়ে খালি উনুন, উবু করা হাঁড়ি, রান্নাসাজহীন রক, খালি পিঁড়েটা। বাসি নেই সেখানে।

চকিতে মনটা তাদের ভেঙ্গে টুণ্ডা হয়ে যায়, জড়সড় হয়ে বসে লম্ফটার দিকে দিকে চেয়ে থাকে। তাদের মুখে বেদনা না কান্না ঠাহর পাওয়া যায় না। উদ্‌বন্ধনে মৃত একদল চোখ চাওয়া মড়ার মত বসে থাকে তারা, অসহায় উদ্দীপ্ত জোড়া জোড়া চোখ। অন্ধগুহার গায়ে একদল প্রস্তর মূর্তি নয় তো যেন ভুতুড়ে পুতুলেরা বোবা অস্থিরতায় নিরেট।

বাসি চলে গেছে···

হ্যাঁ, বাসি চলেছে সহর ছাড়িয়ে, পবনের পাশে পাশে দীর্ঘ মাঠের পথ দিয়ে গঙ্গার দিকে। পবনের হাতে একটা টিনের সুটকেশ, পরনে কারখানার পোষাক। দুলে দুলে উঠছে তার শক্ত জোয়ান শরীরটা চলার তালে তালে।

আঃ! কি অফুরন্ত হাওয়া। সন্ধ্যা রাত্রির তারাভরা আকাশ। সেই আকাশে মিশে গেছে মাঠ গঙ্গা। হাওয়ার শরশরানি গান গেয়ে চলেছে, ডাক দিয়েছে যেন দূর চক্রবালের কানাচে অস্তগামী সূর্য্যের তপ্ত ধূসর আকাশ।

প্রাণ খুলে বক্ বক্ করে চলেছে পবন, জানিস্ বাসি, চন্দননগর সহরটা ভারী সোন্দর। খুব ছোট মোট একখানা ঘর দেখেছি। ভাড়াও খুব কম। আমার এক দূর সম্পর্কের পিসি আছে, তাকে বলব আমাদের বে দিতে অ্যা? মাইরী, তুই যা ভোগালি—উঃ। কালকেই সব গুছিয়ে ফেলব ঘরের। তবে বলি তোকে, আমার না, তিনশো টাকা আছে—মাইরী। তুই যা খুসি তাই করিস্।

এসব বলতে বলতে তারা গঙ্গার ধারে এসে পড়ে।

তীব্র বেগে জোয়ার ছুটে চলেছে উত্তরে। তারার আলো ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিমেষে হারিয়ে যাচ্ছে।

পবন বলল, আজকে আর খেয়া লৌকয় লয়, জান্‌লি বাসি। সে তো সব সময়ই হয়। আজকে একটা পুরো লৌকই ভাড়া করব অ্যা ?

মাঝগঙ্গার অন্ধকারে আচমকা মাথা তোলা ঢেউয়ের মতই বিচিত্র হেসে ঘাড় নাড়ে বাসি।

পবন নৌকা ডাকে। নৌকা দর দস্তর করে বলে, ওঠ্ বাসি, জোয়ারের টানে পেরুই, শালা ভাঁটার আবার বেশী টাইম লেগে যাবে।'

বাসি হঠাৎ পবনের পায়ের উপর পড়ে বলে উঠল, আমি যাব না, না মিস্তিরি ফিরে চল।

পবনের মনে হল গলায় এসে তার প্রাণটা ঠেকে গেছে।—অ্যা, কি বল্‌ছিস্ তুই, পাগল নাকি ? ওঠ্ ওঠ্।

বাসি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, আমি পারব :না মিস্তিরি। এত্‌খোনে ওরা না জানি কি করছে। ওরা নিশ্চয় মারামারি করছে, মরছে বুঝি মারামারি করে।

করুক। ধম্‌কে ওঠে পবন, সবাই করে, ওঠ্।

কিন্তু বাসির প্রাণে আরও উৎকণ্ঠা, আরও বেশী অস্থির হয়ে ওঠে সে। না ফিরে চল মিস্তিরি! .....

পবন হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না।

মাঝি বলল, যাবে না কি ?

পবন দেখল, অন্ধকারে চোখের জল চক্ চক্ করছে বাসির গালে। জামা নেই, হাওয়ায় কাপড় এলোমেলো। হাওয়াতেই বুঝি শিউরে শিউরে উঠছে তার শরীরটা। আর জোয়ারের জলে ভেজা পাড়ের মত কেমন চক্‌চক্ করছে বাসির রংটা।.. কিন্তু বাসি একেবারে মুখ ঘুরিয়েছে।

কান্নাই পায় নাকি রাগই হয়, পবনও আর পারে না। সে মাটির উপর আছড়ে ফেলে স্যুটকেশটা। ছেঁড়া গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, নাঃ শালা মেয়েমান্‌ষের

সঙ্গে কখ্খনো ভালবাসা করতে নেই। যা—যা, তুই আমার সাম

থেকে চলে যা।'

রহস্যময়ী অন্ধকারে করুণ চোখ তুলে তাকাল বাসি পবনের দিকে।

পবন আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, যা বল্‌ছি।...

তার সে চীৎকারের প্রতিধ্বনি উঠল জোয়ারের ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

মাঠের পথ ধরে বাসি ফিরে চলল, ধীরে ঝুঁকে পড়ে, যেন হাওয়ায় গা ভাসিয়ে। সে হাওয়ায় ভেসে গেল তার ফিস্‌ফিসানি, আমি পারব না, ওরা যে মরে যাবে!—

রুদ্ধনিশ্বাসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পবন। রাগে দুঃখে স্তব্ধ।

অন্ধকার মাঠটা তার দিকে যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার কিনারে কিনারে ঢেউয়ের ছলছলানি যেন হেসে হেসে বিদ্রূপ করে উঠল তার কিছুক্ষণ পূর্ব্বের স্বপ্ন রচনাকে।

সে ফিরে তাকাল ওপার চন্দননগরের দিকে। গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসা হাওয়ায় তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ল চোখে মুখে।

হঠাৎ তার চোখ দুটো জ্বালা করে—মাঠ গঙ্গা চন্দননগর...সব ঝোপসা হয়ে গেল। উবু হয়ে স্যুটকেশটা কুড়িয়ে সে আবার ওপারের অন্ধকারের দিকে দেখল। নাঃ বাসি যদি নেই তবে আর চন্দননগরে কি আছে!..

বাসির ফিরে চলা মাঠের পথ ধরে স্যুটকেশটা কাঁধে নিয়ে এগুলো সে।

সমাপ্ত

ম.

য় গা

ওরা

রে

